প্রকাশকের বক্তব্য

সাহিত্য-পরিক্রমা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি। বিষয়-বস্তুর সময়োপযোগিতায় এবং লিখনপারিপাট্যের সরসতায় গ্রন্থখানি চিত্তগ্রাহী ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মর্মে কোন্ সুরটি বারবার ঝঙ্কৃত হইয়াছে, অথবা বিহারীলালের কাব্যপ্রতিভা কোন্ পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা মনকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি বাংলা কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনার ধারা এবং বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য সম্পর্কিত রচনা দুইটি তথ্য-সম্ভারে পাঠকদের চিন্তার খোরাক জোগায়। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি যেমন মনোজ্ঞ, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখাটি তেমনি মননশীলতার পরিচায়ক। ইহাদের সহিত বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব নিবন্ধে লেখক একটি প্রয়োজনীয় আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। সর্বশেষ প্রবন্ধটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, বৈষ্ণব-কাব্যে মুসলমান কবিরাও যে অসামান্য দান রাখিয়া গিয়াছেন এ তথ্য প্রকাশ করিয়া লেখক হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই উপকার করিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক সাধারণ, এবং বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাঁহাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীরা, এই গ্রন্থ পাঠে লাভবান হইবেন।

সাহিত্য-পরিক্রমা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ

প্রকাশক

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

"মাতৃকা"

৪৪এ, রাণী হর্ষমুখী রোড

পাইকপাড়া, কলিকাতা

ভাদ্র ১৩৪৬

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর

শ্রীরাধারমণ দাস

ফাইন আর্ট প্রেস

৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গবাণীর প্রতি যাঁহার অসীম শ্রদ্ধা

এবং

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য যিনি সর্বদা চেষ্টিত

সেই বঙ্গগৌরব মনীষী

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

এম্, এ , বি, এল , ডি, লিট্ , বার্, এ্যাট্, ল.

মহাশয়কে

পরম শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে

এই সামান্য গ্রন্থখানি সমর্পণ করিলাম ।

ভূমিকা

শ্রীমান্ কনক বন্দ্যোপাধ্যায তাঁহার 'সাহিত্য-পরিক্রমা'র একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিযাছেন। বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি পূর্বেই পরিচয লাভ করিযাছেন এবং তাঁহার বিবিধ প্রবন্ধ নানা মাসিক-পত্রিকার শোভা বর্ধন করিয়াছে। সুতরাং আমি পরিচিতিচ্ছলে তাঁহার জযগান করা অনাবশ্যক মনে করি। সাহিত্যপথের এই নবাগত পথিকের শুভকামনা করিবার অধিকার আমার আছে। তাঁহার স্বর্গত পিতা চারুচন্দ্র আমার একজন আবাল্য সুহৃদ্ ছিলেন। চারুচন্দ্রের রচনা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যেমন সহায়তা করিযাছে, আধুনিককালে অধিক লোকের লেখা সেরূপ করে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাঁহার সাহিত্যিক গবেষণা, তাঁহার উপন্যাস ও অন্যান্য মৌলিক রচনা বঙ্গ-সাহিত্যের যেরূপ গৌরব বর্ধন করিযাছে, কনকের পক্ষে সেই উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে বলিযা আমি আশা রাখি। কনকের শিক্ষা দীক্ষা ও চেষ্টা তাঁহার পিতারই অনুপ্রেরণায় লব্ধ এবং এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সেই কথাই বারংবার মনে উদিত হয়। চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁহার প্রবন্ধগুলিকে যে মূল্য দান করিযাছে, তাহা ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ বলিয়া আমি মনে করি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালযে বাংলা ভাষার অনুশীলন যেরূপ সমাদর লাভ করিতেছে, তাহাতে এই শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণ্যে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমি ভরসা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয

আশ্বিন, ১৩৪৬

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

"সাহিত্য-পরিক্রমা"র প্রায় সকল প্রবন্ধই কোনও না কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলিকে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইল। প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই। কারণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে নানান্ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। তবে এই প্রবন্ধগুলি হইতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলি ধারার সহিত পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইবে। এই গ্রন্থে বাংলা গীতিকাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস-সাহিত্য, নাট্য-সাহিত্য প্রভৃতির উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য যে কতদিক দিয়া কত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু আভাষ দিয়াছি "বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধে। এই গ্রন্থে মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি, এবং সেই আলোচনা প্রসঙ্গে মুসলমান বাঙ্গালী কবিগণও যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কতখানি সহায়তা করিয়াছিলেন সে কথা বলিয়াছি।

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে বি, এ এম্, এ. পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় বাংলা-সাহিত্যে এই ধরণের আলোচনার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই অভাব খানিকটা পূরণ করিবার জন্য এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইল। এক্ষণে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকবৃন্দের নিকট গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিলে আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে আমার স্বর্গগত পিতৃদেব শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাল্য সুহৃদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অন্যতম অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর আমার একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের অধ্যাপনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক মতামত গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার অধ্যাপনার কিছু কিছু টীকা-টিপ্পনী আমি এই গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাকেও আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আশ্বিন, ১৩৪৬ — কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুর

সমগ্র বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে যেমন ক্রমাগত সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি রবীন্দ্রকাব্যে অসীমের তীব্র আহ্বানে ব্যাকুল হইয়া অসীমের সহিত মিলনের বাসনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ক্রমাগত সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলনের জন্য রবীন্দ্রনাথ একান্ত উৎসুক। ইহাই তাঁহার কাব্য-সাধনার মূলকথা। অতি কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস অসীমের এই আহ্বান শুনিয়াছিল, এবং সেই সময়কার রচনার মধ্যেও মাঝে মাঝে এই অসীমের আহ্বানের সুরটি বাজিয়াছে। এখনও তাঁহার কাব্যে সেই সুরই ধ্বনিত হইতেছে। কবি চিরকাল বলিয়াছেন—"আগে চল্ আগে চল্ ভাই", এবং তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন, "আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'।" বালক রবীন্দ্রনাথ অনিশ্চিত আশঙ্কায় "ভৃত্যরাজকতন্ত্রের" কঠোর শাসনে খড়ীর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন বটে। কিন্তু সেই বয়সেই অসীমের আহ্বান তাঁহার চিত্তকে অসীমের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া-

ছিল। তিনি একটু ফাঁক পাইলেই বাহিরের জগতের মধ্যে—অসীম আকাশের মাঝে তাঁহার উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেন। এ-সম্বন্ধেও তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা যেমন-খুসি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আমরা আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে। কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই।" বিশ্বপ্রকৃতি কবির কাছে অসীমের এই আহ্বান আনিয়া পৌছাইয়া দিত—অতি কিশোর বয়স হইতেই তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অসীমের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার বালককালের রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত রচিত সকল কাব্যেই নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবার ব্যাকুল বাসনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' প্রভৃতি বালককালের কাব্যেও কবি দেখাইয়াছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-সম্বন্ধ কত নিবিড়—কত ঘনিষ্ঠ। উল্লিখিত কাব্য দুইখানিতে দেখা যায় যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কবি অসীমের সন্ধান পাইয়াছিলেন। "বনফুলে"র মধ্যে কবি হিমালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনার সঙ্গে অসীমের উদ্দেশে নির্ঝরের যাত্রার কথাও আছে। নির্ঝর অসীমের বুকে গিয়া আত্মসমর্পণ করে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কবির সীমাবদ্ধ মনও অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।—

প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ।
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান্।
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে. শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গে উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান।
... .
মানুষ বিস্ময়ে ভয়ে দেখে' রয় স্তব্ধ হ'য়ে
অবাক হইয়া যায় সীমাবদ্ধ মন।

আকাশের নক্ষত্ররাজি হইতে কবির কাছে অসীমের আহ্বান আসিত—

নক্ষত্রনিচয় খোলা জানালায়
উঁকি মারিতেছে মুখের পানে,
খুলিয়া মেলিয়া অসংখ্য নয়ন
উঁকি মারিতেছে যেন রে গগন,
জাগিয়া ভাবিয়া দেখিলে তখন
অবশ্য বিজয় উঠিত কাঁপি। —বনফুল

"বনফুলে"র নায়িকা কমলা বিশ্বপ্রকৃতির অসীমতার মধ্যে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে—

আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যেথা কলকল স্বরে,
সুবাস নিঃশ্বাস ফেলে বন-ফুলদল।

ইহা আমাদের কবির নিজেরই অন্তরের বাসনা।

"কবি-কাহিনী"র প্রথম সর্গেই কাব্যের নায়ক-কবি তাহার শৈশব কালের যে পরিচয় দিয়াছে তাহার সহিত অসীম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মিলনোন্মুখ রবীন্দ্রনাথেরই বালক-কালের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।—

জননীর কোল হ'তে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফল
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে বাহিরের জগতের সহিত মিলিবার সুযোগ পান নাই কিন্তু "কবিকাহিনী"র শিশু-কবি অবাধে বাহিরের জগতে খেলা করিয়া বেড়াইত এবং অসীমের সংস্পর্শে আসিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।—

প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হ'ত তারাময়া,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রুজলে
ফেলিতেন উষাদেবী সুরভি নিঃশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর,
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধানের শীষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি' গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।

অন্যত্র—

প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,

কহিত প্রকৃতি-দেবী তার কানে কানে,
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপিচুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

কবির ধর্ম কি এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁহার বালক কালেই গঠিত হইয়া গিয়াছিল। কবি-মানস যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমাগত সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমকে পাইতে চাহে এই কথা তাঁহার 'কবি কাহিনী'তেই প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বাধীন বিহঙ্গ-সম কবিদের তরে, দেবী,
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র-সম আছে যাহাদের মন,
তাহাদের তরে, দেবী, নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে চায়
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তারা আকুল বিলাপে।

কবির কিশোর বয়সে রচিত "ভগ্নহৃদয়ে"র মধ্যেও দেখা যায় যে বিশ্ব-প্রকৃতি কবির কাছে অসীমের আহ্বান আনিয়া দিয়াছে। কবি সেই অসীমের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।—

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে,
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি' বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখী করিতে প্লাবিত।

অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলনা কেবল,
চৌদিকে দিগন্ত আসি' রুধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস,
দুরন্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্য পান করি'
আনন্দ-সঙ্গীত স্রোতে ফেলিত গো শূন্যতল ভরি'।

অসীমের সহিত মিলনের যে বাসনা কিশোর কবির মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল উহা তাঁহার পরবর্তীকালের সকল কাব্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। "গীতাঞ্জলি"তে অসীমের উপলব্ধিতে তাঁহার আনন্দের কথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

"উৎসর্গে"র 'আবর্তন' কবিতাতেও কবির এই আনন্দ সুপরিস্ফুট—

অসীম সে চায় সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।

অতি কিশোর বয়সেই কবির এই ধরণের উপলব্ধি জাগিয়াছিল। তিনি তখন হইতেই পথিক বেশে ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিতে চান এবং সকলকে তাঁহার যাত্রা-পথের সঙ্গীরূপে লইয়া তিনি অগ্রসর হইতে চাহেন—

ছুটে আয় তবে,—ছুটে আয় সবে,
অতি দূর দূর যাব,
কোথায় যাইবে ?—কোথায় যাইব !

জানি না আমরা কোথায় যাইব —
সমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়,—

"প্রভাত সঙ্গীতে" কবি যখন তাঁহার নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন তখন হইতে অসীমের আহ্বান তাঁহার মনকে খুব বেশী করিয়া আলোড়িত করিয়াছে। "সন্ধ্যাসঙ্গীতে" কবির মন ছিল অবরুদ্ধ। তখন অসীমের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি অল্প। সেইজন্ত ঐ কাব্যে অসীমের সহিত মিলনের জন্ত অবরুদ্ধ অবস্থার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু "প্রভাত সঙ্গীতে" অসীমের সহিত মিলনের আনন্দে কবি উল্লসিত। "প্রভাত সঙ্গীতে"র প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে আনন্দের সেই উচ্ছল তরঙ্গ অনুভূত হয়। "প্রভাত উৎসব" কবিতায় এই অসীমের আহ্বানে কবির উন্মুক্ত হৃদয় উন্মত্ত হইয়া অসীমের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। সীমাবদ্ধ কবিমন হঠাৎ অসীমের আভাস অনুভব করিয়া উল্লসিত হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।

অসীম অনন্তের আহ্বান কবির কানে পৌঁছিয়াছে। তিনি সেই অনন্ত অসীমকে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

আকাশ, এস এস ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।
.. . ..
আকাশ পারাবার বুঝি হে পার হবে,
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে।

মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদিত রবীন্দ্র-কাব্য-গ্রন্থাবলীতে 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে"র কবিতাগুলির তিনি নামকরণ করিয়াছিলেন 'হৃদয়-অরণ্য'।

বাস্তবিক কবির মন তখন অরণ্যের অন্ধকারে বিশ্বপ্রকৃতি ও অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। কবি নিজেই "প্রভাতসঙ্গীতে"র 'পুনর্মিলন' কবিতায় তাঁহার কাব্যসাধনার ইতিহাসে দুইটি বিশিষ্ট যুগের উল্লেখ করিয়াছেন।

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।

ইহা হইতেছে "সন্ধ্যাসঙ্গীতে"র যুগ।

ইহার পরে 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে কবির 'নিষ্ক্রমণ' হইয়াছে—তিনি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' করিয়া অসীমের দিকে যাত্রা করিয়াছেন—

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

ইহা হইতেছে "প্রভাত-সঙ্গীতে"র যুগ। তখন প্রকাশের আনন্দে কবির মন-প্রাণ বিভোর হইয়া উঠিয়াছে—অসীমের আভাস পাইয়া তখন কবিচিত্ত আনন্দিত। "প্রভাত-সঙ্গীতে"ই প্রকৃতপক্ষে অসীমের সহিত কবির মিলন হইয়াছিল। কবির 'কৈশোরক' পর্যায়ের রচনায় অথবা "সন্ধ্যাসঙ্গীতে" কবির সহিত অসীমের মিলন কখনও হইয়াছে আবার কখনও বা সেই মিলন ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু "প্রভাতসঙ্গীত" ও ইহার পরবর্তীকালে রচিত সমস্ত কাব্যেই কবির অন্তরের গতিবেগ 'স্রোত' হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চল রে সেথা যাই। —স্রোত

"প্রভাত সঙ্গীতে"ই 'অনন্ত-জীবন' নামক কবিতায় কবির এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিক হ'তে সেথা অবিরাম বিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি'।
পৃথ্বী হ'তে মহাস্রোত ছুটিতেছে নিশিদিন
সেই মহাসাগর-উদ্দেশে,
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি'
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে।
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ,
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

অসীমের আকর্ষণেই কবির প্রতিভা-নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল। নির্ঝর গিরিগহ্বরে আবদ্ধ ছিল। সেখানে বাহিরের জগতের আলো-বাতাস প্রবেশ লাভ করিত না। অকস্মাৎ রবিরশ্মির আলোকপাতে সেই নির্ঝর প্রবলবেগে বাহির হইয়া পড়িল আলো-বাতাসের জগতে এবং অপূর্ব ছন্দে ও গানে নৃত্য করিতে করিতে অসীমের উদ্দেশে যাত্রা করিল। ইহা তো কবিরই নিজের কাব্যসাধনার কথা। যতদিন তিনি অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্ধভাবে আপনাতে আপনি আবদ্ধ ছিলেন ততদিন তাঁহার এক সুগভীর বিষণ্ণতা ছিল। এই বিষাদ ও নৈরাশ্যের ভাব কবির "প্রভাতসঙ্গীতে"র পূর্ববর্তী সকল কাব্যেই সুপরিস্ফুট। কিন্তু "প্রভাতসঙ্গীতে" তাঁহার সেই স্বপ্নদশা ঘুচিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হ'য়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে।

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসীমের ডাক কবির অন্তরে পৌঁছিয়াছিল—অসীমের আহ্বানে কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীর মতই উচ্ছল তরঙ্গে গলিয়া বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কবি অসীমের ডাক শুনিতে পাইয়াছেন।—

কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন।
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়।
কে আসিবি কে আসিবি কে তোরা আসিবি আয়।

সীমাবদ্ধ কবিমন সীমার বাঁধন ভাঙ্গিয়া নির্ঝরের মত অসীমের বুকে নিজেকে বিলীন করিয়া দিবার জন্য উৎসুক। কবি যাত্রা করিবেন অনন্ত-অসীম পথে—

আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণা গান।
উদ্বেগ অধীর হিয়া সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ!

"প্রভাত সঙ্গীতে"র 'প্রভাত উৎসব' এবং 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এই দুইটি কবিতাতেই কবির অন্তরকে অসীমের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

"প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটিকাতে এই একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র সন্ন্যাসী ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া অসীমকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছে। সে বলিয়াছে, "অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী।" কবি নিজেই ঐ নাটিকার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"সন্ন্যাসী লোকালয়কে তুচ্ছ মায়া, অন্ধতার গহ্বর ব'লে সমস্ত ত্যাগ ক'রে দূরে চ'লে গেল। আকাশের রস-বর্ণ-গন্ধ-ছটা সব তার চৈতন্যের থেকে অপসারিত হ'ল। সে আপনাকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার ক'রে অসীমকে পাবার জন্য পণ করল। তারপর কোথা থেকে একটি ছোট মেয়ে দেখা দিল, সে নিরাশ্রয় ছিল, সন্ন্যাসী তাকে গুহায় নিয়ে এল। মেয়েটি তাকে ধীরে ধীরে স্নেহের বন্ধনে বাঁধ্‌ল। তখন সন্ন্যাসীর মনে ধিক্কার হ'ল। সে ভাব্‌তে লাগল যে এই তো প্রকৃতি মায়াবিনী দূতী হ'য়ে এম্‌নি ক'রে মেয়েটিকে পাঠিয়েছে। সে সন্ন্যাসীকে অসীম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সীমার মধ্যে আবদ্ধ কর্‌তে চায়। এই সংগ্রাম যখন চলেছে তখন একদিন সে ক্রোধের বশে মেয়েটিকে ত্যাগ কর্‌ল।—সন্ন্যাসী যতদূরে স'রে যেতে লাগ্‌ল ততই মেয়েটির ক্রন্দন তার হৃদয়ে এসে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল। শেষে মেয়েটি যে বাস্তব, মায়া নয়—তা সে বেদনার আঘাতে বুঝ্‌তে পার্‌ল। মনের এই অবস্থায় সে দূরে দাঁড়িয়ে লোকালয়ের দৃশ্য দেখতে লাগ্‌ল। তার মাধুর্যে মানুষের সুহৃৎপ্রীতি সম্বন্ধের সরসতায় তার মন ভ'রে উঠল। সে বল্‌লে—ফেলে দিলুম আমার দণ্ড কমণ্ডলু—দূর হ'য়ে যাক্ আমার এ সব আয়োজন। সীমাকে বর্জন ক'রে আমি তো কোনো সত্যই পাই নি। একটি ছোট মেয়েকে স্নেহ কর্‌তে পেরেছিলুম ব'লেই তো সেই রসের মধ্যে অসীমকে পেয়েছি।—তার বাইরে তো অনন্ত-স্বরূপের প্রকাশ নেই।—"

"প্রকৃতির প্রতিশোধে"র প্রতিপাদ্য বিষয়টা বাল্যকালে আমার নানা

বনের পাখী বলে "আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।"
খাঁচার পাখী বলে, "খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।"
বনের পাখী বলে "আপনা ছাড়ি" দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।"

ইহাও হইতেছে সীমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙিয়া অসীমের বুকে নিজেকে নিমজ্জিত করিবার বাসনা। আমাদের অবরুদ্ধ মনের মধ্যে আসিয়া অচিন পাখী বন্ধনবিহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়। মন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে কিন্তু পারে না। এই ব্যাকুলতার কারণ কবি নিজে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন "আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছা-বিহারপ্রিয় পুরুষ এবং গৃহবাসিনী অবরুদ্ধা রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন সমস্ত জগতের নূতন নূতন দেশ ঘটনা অবস্থার মধ্যে নব-নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শত-সহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখী আর একজন খাঁচার পাখী। এই খাঁচার পাখী টাই বেশী করিয়া গান গাহে, কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্য একটি ব্যাকুলতা একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে ও বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"— রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক সাহিত্য ২৫ পৃষ্ঠা।

কবি ক্রমাগত যাত্রা করিয়া 'অকূল পাড়ির আনন্দ' অনুভব করিবার

জন্য ব্যগ্র। তটের রেখার দ্বারা কবির অসীমের দিকে যাত্রা যেন স্থগিত না হয়—তিনি 'অন্তবিহীন অজানাকে' জানিবার জন্য ব্যাকুল—

সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকাখানি,
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি?

.

দুলুক তরী ঢেউয়ের 'পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাওরে আজি নিশীথ-রাতে
অকূল পাড়ির আনন্দ গান।
যাক্ না মুছে তটের রেখা,
নাইবা কিছু গেল দেখা,
অতল বাবি দিক্ না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দুহাত মেলি'
অন্তবিহীন অজানাকে।

কবি তাঁহার মানস-সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কতদূরে নিয়ে যাবে, কোন্ লোকে—

"বসুন্ধরা" কবিতায় কবি জলস্থল আকাশের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া নিজেকে অসীম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত। বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার। হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে।—

কবির যাত্রা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' একথা তিনি অনেকবারই বলিয়াছেন। কোথায় এবং কাহার অভিসারে তিনি যাত্রা সুরু করিয়াছেন তাহা কবি জানেন না।—

দুর্দিনের অশ্রু-জল-ধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি'। তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন-সর্বস্ব-ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে—

জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও কবির যাত্রা স্থগিত হয় না। তিনি

একাকী নূতন পথে যাত্রা করিবার জন্য উন্মুখ। অজানা অসীমে কবিচিত্ত পক্ষবিস্তার করিয়া চলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা।

অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য কবির 'দুরন্ত আশা' জাগিয়াছে। কবি তাঁহার বহু কবিতাতেই ক্ষুদ্রত্ব এবং সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চাহিয়াছেন। নিরীহ নির্জীব অবস্থা কবির কাছে ভাল লাগে না। তিনি বলেন, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন্।' মরুভূমির ঝড় যেমন অবাধে প্রবাহিত হয় কবিও তেমনি উদ্দাম গতিবান্ প্রাণ পাইয়া ক্রমাগত যাত্রা করিতে চাহেন। কবি "বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান" থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বরং বাধাবন্ধহীন আরব বেদুইনের জীবন কবির কাছে বরণীয়।—

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি, চলেছি নিশিদিন,
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

কবি নিজেকে "সুদূরের পিয়াসী" ও "প্রবাসী" বলিয়াছেন। কবি সেই সুদূরের পরশ পাবার প্রয়াসী—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায় আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,

ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।

এই সুদূরের সহিত মিলিত হইতে না পারিলে কবির মনে ব্যথা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে।—

সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি'।

এই কবিতাতেও অনন্তের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমাগত সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া অসীমের অভিমুখে যাত্রা করারই কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

"প্রবাসী" কবিতার মধ্যেও এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানেও কবির কল্পনাবিলাসী মন অসীমের মধ্যে প্রসাবিত হইয়াছে। জীব মাত্রেই অনন্ত অসীমের অংশ মাত্র। সেইজন্য কবি নিজেকে প্রবাসী বলিয়াছেন—অসীমের সহিত আত্মীয়তাবোধের জন্যই কবি অনুভব করেন যে তিনি প্রবাসী। কবি উপলব্ধি করিয়াছেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তাবকা মোর নাম যেন জানে সে।
বিশাল বিশ্বে চাবিদিক হ'তে প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমাব দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে।

"ক্ষণিকাব" 'উদ্বোধন' কবিতায় কবি 'নদীজলে পডা আলোর মতন" ক্রমাগতই যাত্রা করিয়া চলিতে চাহিয়াছেন। বিশ্বেব অসীম রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ প্রভৃতি কবি উপভোগ কবিতে চাহেন। কবি চাহেন বৈচিত্র্য—অকাবণ পুলকে তিনি অসীমেব দিকে আনন্দেব উৎস সন্ধানে যাত্রা করিতে উৎসুক।—

শুধু অকাবণ পুলকে
নদীজলে পডা আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধবণীব পবে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ কবিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দোলে শিশিব যেমন শিবীষ ফুলের অলকে।
মর্মবতানে ভ'বে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে।

কবি বলিযাছেন—

ম্লান দিবসেব শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমাব যাত্রা করিতে সাবা।

'বর্ষশেষে'র সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্ত সকল প্রকার বন্ধন-মুক্ত হইযা অনন্ত অসীমেব উদ্দেশে যাত্রা কবিবাব বাসনা প্রকাশ কবিয়াছে—

হে কিশোব, তুলে লও তোমাব উদাব জয়ভেবী,
কবহ আহ্বান।
আমবা দাঁডাব উঠি', আমবা ছুটিযা বাহিবিব,
অর্পিব পরাণ।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

..

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।

এই কবিতার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন—"১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুক্‌নো পাতা উড়িয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আস্‌তে হবে।"

—শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩২ বৈশাখ

কোন্ আদিকাল হইতে কবির এই অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু হইয়াছে কবি তাহা জানেন—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবন স্রোতে।

অন্যত্রও কবি বলিয়াছেন—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

কবির যাত্রা অনাদি অনন্ত—

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।

সকল বোঝা ফেলিয়া রিক্ত হাতে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে কবি যাত্রা করিতে ইচ্ছুক।

রিক্ত হাতে চল্‌না বাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।

ক্রমাগত অসীমের দিকে তাঁহার জীবনতরী ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথায় কোন্ দেশে কবির যাত্রা তাহা তিনি জানেন না।—

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জান্‌বে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।

তীরে বসিয়া কবির মন অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু অসীমের বুকে পাড়ি দিবার আনন্দে কবি উল্লসিত হইয়া উঠেন।—

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে ব'সে যায় যে বেলা মরি গো মরি।

কবির এই অসীমের যাত্রা হইতে কেহই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিবে না।—

যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।

সীমাবদ্ধ পথে যাত্রা করিতে কবি অনিচ্ছুক—

বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো টলিয়ে দাও।
পথের শেষে মিল্‌বে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও।

কারণ তাঁহার কাছে সুদূরের ডাক আসিয়া পৌছায় বারবার—অনন্তকাল ধরিয়া অসীমের উদ্দেশে অবারণ চলার আনন্দে কবি উল্লসিত। পথই তাঁহার সাথী—তিনি 'অকূল পাড়ির' পথের পথিক—তাঁহার যাত্রা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'।

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা
পথে যেতেই ভালবাসা,
পথে চলার নিত্য-রসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি'।

কবির যাত্রা কখনও কোথাও স্থগিত হয় নাই—

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।

অসীম সাগর-পারের ডাক কবিকে উতলা করিয়াছে—

এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর পারের গোপন পুরে।

'শিশু ভোলানাথ' রূপে কবি বলিয়াছেন—

সাত সমুদ্র তের নদী
আজ্‌কে হব পার।

অন্যত্র—

আজ্‌কে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চ'লে।
যত তুমি ভাব্‌তে পারো
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ কর্‌তে পার্‌ব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।
অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।

কবি চিরযুবা। সেইজন্য তিনি সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। অসীমের উপলব্ধির জন্য ক্রমাগত তরী বাহিয়া ভাসিয়া চলিয়া যৌবনের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার ধর্ম। এই ভাসিয়া চলার জন্য সকলকে তিনি তাঁহার নিমন্ত্রণ জানাইতেছেন—

পারবি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খ'সে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।

আমাদের জীবনের চারিদিকে অনবরত বাধা বিপত্তির অচলায়তন

গড়িয়া উঠিয়া আমাদের গতির বাধা সৃষ্টি করে। কবি সেই সীমার বাঁধ সহ্য করিতে পারেন না। অচলায়তনের গণ্ডী ভাঙিয়া তিনি আমাদিগকে ক্রমাগত চলিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

"বলাকা"র মধ্যে কবির 'এই অকারণ আবরণ চলার' কথা খুব বেশী করিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বলাকার প্রত্যেকটি কবিতা অজ্ঞাত অসীমের আহ্বানে ও ইঙ্গিতে ভরপুর। 'হেথা নয় হেথা নয়, আর কোনোখানে' এবং 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' বলিয়া কবি ক্রমাগত সেই অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি তাঁহার অনন্ত যাত্রা স্থগিত করিতে অনিচ্ছুক। কারণ থামিতে গেলেই—

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

সেইজন্য চিরযুবা কবি তাঁহারই মত চিরযুবাদের আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

আন্‌রে টেনে বাঁধা পথের শেষে।
বিবাগী কর অবাধ পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।

—সবুজের অভিযান

নবীন সর্বনেশে—সে পুরাতনের প্রতি কোনো মমতা দেখায় না। পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া সে উহাকে লোপ করিয়া দিতে চায়। এই সর্বনেশে নবীনদের আমন্ত্রণ জানাইয়া কবি বলিতেছেন—

শুনিস্ নি কি ডাক পড়েচে
নিরুদ্দেশের দেশে গো!
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

—বলাকা, ৫ নম্বর

কবি বলেন যে মানুষ ক্রমাগত নিজেকে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিবে দেবত্ব লাভ করিবার জন্য—

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত সীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?
—বলাকা, ৩৭ নম্বর

অসীমের উদ্দেশ্যে নদীর যাত্রা। কিন্তু নদীর সেই গতি যদি স্থগিত হয় তাহা হইলেই আবিলতা আবর্জনা জন্মে ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।—

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি' তারে,
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে,—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।
—চৈতালি, দুই উপমা

'চঞ্চলা' কবিতাতেও কবি এই চলার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।—

চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।

নদীর পরিবর্তনের স্রোত ক্রমাগত চলিয়াছে—কবি সেই গতিপ্রবাহে

গা-ভাসাইয়া দিয়া ক্রমাগত চলিতে চাহেন। বিশ্বের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে—চলার যে লীলা হইতেছে তাহার অপরূপতা প্রত্যক্ষ করিয়া কবি যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, এবং তাঁহার এই কবিতার ছন্দে সেই নৃত্যের দোলা প্রকাশ পাইয়াছে। অসীমের সর্বনাশী প্রেমে নদীর স্রোতের অবাধ গতি কবির অন্তরে বেশ স্পষ্ট ছাপ রাখিয়াছে।

কবি জানেন, এবং বহু কবিতাতেই তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জমে, আর গতিতে বস্তুর রূপ ফুটিয়া উঠে। সেইজন্য কবি অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া ক্রমাগতই চলিয়াছেন। নদীর স্থিতি-হীন প্রবাহ তাঁহার অন্তরে অফুরন্ত আনন্দের সঞ্চার করে—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে। —বলাকা চঞ্চলা

এই 'চঞ্চলা' কবিতাতেই নদীকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে

পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকুল আলোতে।

ইহা কবিজীবনেরই আদর্শ। কবির প্রতিভা-নির্ঝর সেই 'প্রভাত সঙ্গীতে'র যুগ হইতে অনন্ত অসীম সিন্ধুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে—তাহার সেই যাত্রা 'বলাকা'র যুগেও স্থগিত নাই। তিনি ক্রমাগত অতল-আঁধারের ভিতব দিযা অকূল-আলোকে যাত্রা করিতে ইচ্ছুক।

'বলাকা' কবিতাতে কবি "পুলকিত নিশ্চলেব অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ" শুনিযাছেন। পর্বত তরুশ্রেণী সকল কিছুই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়া অসীমের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য যেন যাত্রা করিতে চাহিতেছে ইহা কবি অন্তবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন।—

পর্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যাব স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি'
হে পাখা বিবাগী।

অন্যত্র—

এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন কবিকে কবিরই কথার প্রতিধ্বনি করিযা বলিয়া দিতেছে যে সকল কিছুই সেই অসীমের উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল। সবাই যেন ঘোষণা করিতেছে—

"ওগো প্রাণে মনে আমি যে তোমার পরশ পাবার প্রয়াসী।"

"বলাকা"র ৩৮ নম্বর কবিতায় ('নূতন বসন') কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার সর্বদেহে, তাঁহার অন্তরে তাঁহার চিন্তায় ভাবনায় এবং তাঁহার প্রেমে নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। একখানি নূতন বসন পরিধান করিয়া কবির মনে এই ভাবটি খুব বেশী করিয়া জাগিতেছে। নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা নূতন বস্ত্ররূপে কবির সর্বাঙ্গ যেন পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে ইহা কবি মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছেন। গান যেমন বাঁধা সুর অতিক্রম করিয়া নূতন নূতন তানের উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তেমনি কবির দেহ নূতন বসন পাইয়া প্রতিদিনের বাঁধা গণ্ডীকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখ্‌তে কি পায় কেউ।
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়্‌ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি'।

কবি বলিতেছেন নীল রং অনন্তের অকূলের বর্ণ। আজ আমি সেই নীল বসন পরিধান করিয়া অনন্তের অনন্ততাকে আমার বসনের বর্ণে প্রতিফলিত দেখিতেছি।—আমার দেহে-মনে দূরের ডাক লাগিয়াছে—যাহা আয়ত্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া অনায়ত্তকে ধরিতে যাত্রা করিতে হইবে, দূর হইতে দূরান্তরে অজানা অচেনাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতে হইবে, যেমন করিয়া দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া চলে বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘ। "নব মেঘের বাণী" কূল ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রার জন্য কবির অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—

অকূলের বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্ত-পারের বনের সাথে মিল।
আজ্‌কে আমার সকল দেহে বইচে দূরের হাওয়া
সাগর পানে ধাওয়া।
আজ্‌কে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপডখানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান কোণে নব মেঘের বাণী।

"বলাকা"র ৩ নম্বর কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে পশ্চাতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অনবরত ধাবিত হইতে পারাতেই মুক্তি।—

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তারা কাঁদ্‌বে।

কবি তাঁহার মন অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া সাগর গিরি লঙ্ঘন করিতে উৎসুক হইয়া বলিয়াছেন—

মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে
আলোর নেশায় গেচি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের বাঁধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।
সাগর গিরি কর্‌বরে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি'।

সম্মুখধাবনে কবি মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতে গিয়া পৌছাইতে চাহেন—

মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আন্‌ব হ'রে।

কবি যখনই বিরাম বিশ্রামের আযোজন কবিয়াছেন তখনই অভয় 'শঙ্খ' তাঁহার কাছে গতির বাণী আনিয়া দিযাছে। সেই শঙ্খধ্বনি কানে যাওয়াতে কবিব বিবাম বিশ্রাম ঘুচিয়া যায়, একটা গতির উন্মাদনায় কবির চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন কবি আবাব যাত্রাব জন্য উৎসুক হইয়া বলিযা উঠেন—

লড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেযে,
চল্‌বি যারা চল্‌রে ধেয়ে
আয না রে নিঃশঙ্ক। —বলাকা, শঙ্খ

অনন্তের দেশ হইতে কবি নিমন্ত্রণ পান অসীমেব দিকে যাত্রা কবিবার জন্য—

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিযেচে আকাশ পাতাল।
ঘব-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তি মদে করল মাতাল!
খ'সে-পড়া তারার সাথে
নিশীথ রাতে
ঝাঁপ দিয়েচি অতল পানে
মবণ-টানে। বলাকা, ২২ নম্বর

কবি নিজেকে বলিয়াছেন—"আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া"। বৈশাখী মেঘের মত কবিব যাত্রাব শেষ নাই। তিনি বলেন—

আমি যে অজানাব যাত্রী সেই আমাব আনন্দ।
সেই ত বাধায় সেই ত মেটায দ্বন্দ্ব।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি। বলাকা, ৩০ নম্বর

অতীতই সম্পদ্ আর ভবিষ্যৎ রিক্ত—কবির মতে এই ধারণা ভ্রান্ত—

সাম্‌নেকে তুই ভয় করেছিস্। পিছন তোরে ঘিরবে।
এম্‌নি কি তুই ভাগ্যহারা? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে।

সেইজন্য কবি ক্রমাগতই অজানার সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—

কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।

—বলাকা ৩০ নম্বর

"বলাকা"র ৩৭ নম্বর কবিতাতে কবি কাণ্ডারীর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন—তরী বাহিয়া তাঁহাকে নূতন সমুদ্রতীরে পাড়ি দিতে হইবে—

নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেচে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না। —বলাকা, ৩৭ নম্বর

কবি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে চাহেন—

"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রী দল,"
উঠেচে আদেশ,
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

অনন্ত অসীমের আহ্বানে জানাকে উত্তীর্ণ হইয়া অজ্ঞাতের সন্ধানে যাত্রা করিবার জন্য কবি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।—

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি'
উঠিয়াছে জাগি'
ঝটিকার কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান। —বলাকা, ৩৭ নম্বর

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সকল কাব্যেই যৌবনের জয়গান গাহিয়াছেন। যৌবনে তিনি যখন 'কড়ি ও কোমল' রচনা আরম্ভ করেন, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন—"হেথা হ'তে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।" ফাল্‌গুনী নাটকের আগাগোড়া এই যৌবনের জয়যাত্রার কথাই আছে। সেখানে যুবকদল ক্রমাগত 'চলি গো চলি গো যাই গো চ'লে' বলিয়া অসীমের সন্ধানে ও অনায়ত্তকে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "বলাকা"র যুগেও কবি সেই নবীনদের উৎসাহ বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন—হে নবীন, তুমি পথহীন সাগরপারের পথিক, তোমার ডানা চঞ্চল অক্লান্ত। তোমাকে আজ অজানা বাসা সন্ধান করিয়া লইতে হইবে,—জানার বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে।—

তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া,—

কবি নবীনদের তাঁহারই মত অনন্ত অসীমের যাত্রী হইতে বলেন। যৌবন সুখের খাঁচাতে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া বাস করে ইহা কবির কাছে পীড়াদায়ক। তাই নববর্ষে কবি সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছেন—

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী,
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'

ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে। —বলাকা, ৪৬ নম্বর

কবির এই ধরণের আশীর্বাদের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি নিজে যেমন 'শান্তিতে শয়ান' থাকিতে পারেন না—তাঁহার কাছে ক্রমাগত যেমন অসীমের আহ্বান আসিয়া তাঁহাকে অনন্তের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তেমনি তিনি চাহেন যে নবীনেরাও ক্রমাগত নূতনত্ব আস্বাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিবে। তাহাদের এই অসীম অনন্ত যাত্রা যেন কখনও স্থগিত না হয়।

স্থিরতাকে ধিক্কার দিয়া কবি নূতনকে বরণ করিতে ইচ্ছুক। পরিবর্তনের গতির দ্বারা কবি তাঁহার মনকে নানান্ সম্পদে ভূষিত করিয়া তুলিতে চাহেন। কারণ চলার অমৃতরসপানে মনের যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে—

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

এই কারণে কবি নিজেকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমাদের ডাকিস্ পিছে। —বলাকা, ১৮ নম্বর

'পলাতকা' কাব্যের মধ্যেও অসীমের প্রবল আকর্ষণের কথা আছে। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দিয়া অসীমের এই আহ্বান কবির কাছে আসিয়াছিল। প্রকৃতির ডাকে পোষা হরিণ নিশ্চিত আশ্রয় ও অযত্নসুলভ খাদ্য-পানীয়

ছাড়িয়া অনিশ্চিতের ও নিরুদ্দেশের সন্ধানে বনে চলিয়া গেল। পলাতক হরিণ যেন বলিয়া গেল—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর!

"পূরবী"র যুগেও বিরাম বা বিরতির কথা কবির মনে হয় নাই। সেখানেও তিনি ক্রমাগত 'চলো চলো' বাণী ঘোষণা করিয়া অসীমের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—

আশ্বিনের রাত্রি-শেষে ঝ'রে-পড়া শিউলি ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল, তা'রা মরণ-কূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে শুধু বলে 'চলো চলো'।

*   *   *   *

ওরা ডেকে বলে কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে

ইহার উত্তরে কবি বলেন—

যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে।

জীবন-সায়াহ্নেও কবির যাত্রা স্থগিত হয় নাই। তখনও তাঁহার কাছে জীবনদেবতার আহ্বান আসিয়াছে নূতন পথে যাত্রা সুরু করিবার জন্য—সেই আহ্বানে কবির যৌবনোল্লাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তিনি তাঁহার "লীলাসঙ্গিনী" জীবনদেবতাকে বলিয়াছেন—

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ কোণে।
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা প্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,

অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে। —লীলাসঙ্গিনী

"পূরবী"র 'খেলা' নামক কবিতাতেও তিনি তাঁহার জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—তিনি কখনও তাঁহাকে বাঁধা পথের গণ্ডীর মধ্যে চলিতে দেন না। জীবনদেবতা ক্রমাগত তাঁহাকে ক্রীড়াচ্ছলে সীমাবদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করাইয়া অসীমের ইঙ্গিত দেখাইয়া 'অকারণের টানে' আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান।—

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চল্‌তি কাজের স্রোতে
চল্‌তে দেবে নাকো,
সন্ধ্যাবেলার জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হ'তে
তাই কি আমায় ডাকো! —পূরবী, খেলা

"মহুয়া" কাব্যেও কবির কণ্ঠে এই চলার বাণী উৎসারিত হইয়াছে—

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তা'রি রথ নিত্যই উধাও।—"

কিশোর বয়স হইতে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যত কাব্য রচিত হইয়াছে সে সকলের মধ্যেই কবি ক্রমাগত যাত্রা করিয়াই চলিয়াছেন। কোথাও তাঁহার এই যাত্রা স্থগিত হয় নাই। তিনি চিরকাল অনাসক্ত অনন্তপথযাত্রী পথিক। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন—"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ"। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য অনুশীলন করিলে এই জিনিসটিই খুব বেশী করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে তাঁহার কবিচিত্ত ক্রমাগত বিচিত্রতার সন্ধানে অসীমের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। চিরতরুণ কবির অনন্ত-প্রসারী মন তাঁহার সকল কাব্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অসীমের দিকে ক্রমাগত যাত্রা করার এই যে বাণী রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব এবং মূল কথা।

কবি বিহারীলাল

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাস কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথা লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। গীতি কবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। এই গীতি কবিতার সুরলহরী প্রাচীনতম যুগ হইতে—অর্থাৎ চণ্ডীদাস হইতে—আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে ধ্বনিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের প্রথম প্রভাব সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গীতিকাব্যের ধ্বনি খানিকটা ব্যাহত হইয়াছিল। কারণ ইংরেজি কাব্যরসে দীক্ষিত রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের আদর্শে Verse Tale ও মহাকাব্য রচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ঠিক সেই মহাকাব্য ও Verse Tale রচনার যুগেই অর্থাৎ রঙ্গলাল মাইকেল প্রভৃতির সমসাময়িক কালেই কবি বিহারীলাল তাঁহার নিজের মনের কথা কাব্যে প্রকাশ করিলেন একান্তই নিজের ভাবে ও নিজের ছন্দে। মহাকাব্য ও Verse Tale রচনার উৎসাহে গীতিকাব্যের যে সুরটি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিহারীলাল সেই সুরটিকে একেবারে নিজস্ব করিয়া বঙ্গভারতীর বীণায় আবার নূতন করিয়া বাজাইলেন। গীতিকাব্যের এ সুর একেবারে যে

নূতন তাহা নহে। ইহা সেই পুরাতন সুরেরই নূতন এবং সুসংস্কৃত অনুরণন। মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করিলেও তাঁহাদের সেই কাব্যের ক্লাসিক আবরণ ভেদ করিয়া লিরিক গুঞ্জরণ উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিহারীলালের সকল কাব্যই নিছক লিরিক উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। এইখানে বিহারীলালের সহিত তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের প্রতিভার পার্থক্য।

বিহারীলাল তাঁহার নিজের প্রাণের কথা—নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা সরল এবং স্বচ্ছ ভাষায় ঠিক যেমনটি অনুভব করিয়াছেন তেমনি ভাবেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিজের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিজের সুরেই গাহিয়াছেন। প্রাচীন কবিদের মত কোনও নায়ক অথবা নায়িকার মুখ দিয়া তিনি তাঁহার আপন ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হন নাই। অথবা বৈষ্ণব কবিদের মত রাধার বেনামী তাঁহার প্রেম ও প্রীতির উচ্ছ্বাস উৎসারিত হয় নাই। নিজস্ব সুরে নিজের অনুভূতিকে তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। সে যুগে এই শ্রেণীর কাব্যরস জনপ্রিয় হয় নাই বটে, এবং আধুনিক যুগেও বিহারীলালের কাব্যের রসধারা আস্বাদন করিয়াছেন এরূপ জনসংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু এই বিহারীলালই বাংলার গীতিকবিতার একটি নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই বাংলা গীতিকবিতাকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের বাংলা গীতিকবিতা যে তাঁহার কাছে কতখানি ঋণী তাহা আমরা তিনজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা হইতে ধরিতে পারি। ইঁহারা হইতেছেন—অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অক্ষয়কুমার বড়াল প্রকাশ্যভাবে বিহারীলালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিহারীলালের কবিপ্রতিভায় যে সকল বিশিষ্টতা ছিল সে সবই অক্ষয় কুমারের কাব্যে বর্তমান। কল্পনাবিলাস প্রীতিবিভোরতা প্রভৃতি

বিহারীলালের কাব্যের আদর্শ। সেই আদর্শ অক্ষয়কুমারের কাব্যেও সুপরিস্ফুট।—বিহারীলালের কাব্যের বিষয় প্রেম ও সৌন্দর্য। সেই প্রেম ও সৌন্দর্যই অক্ষয়কুমারের কবিতার ভাববস্তু।

রূপ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য বিহারীলালের কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ। অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনাও কখনও বা রূপকে আশ্রয় করিয়াছে—আবার কখনও শুধু ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে। বিহারীলালের কবিহৃদয় বাস্তবের সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এই জন্য তিনি শুধু প্রীতি-প্রেমকে সম্বল করিয়া বাস্তবের সঙ্গে যেটুকু যোগ রক্ষা করিয়াছেন তাহার তুলনায় তাঁহার নিজেরই সৌন্দর্যকল্পনা এত বড় যে এই উভয়ের মধ্যে যোগ-সূত্রটি তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহার মনে মাঝে মাঝে বিস্ময় ও সংশয় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে—

তবে কি সকলি ভুল।
নাই কি প্রেমের মূল।
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার।—সারদামঙ্গল, ৩য় সর্গ

ইহার উত্তর নাই। উত্তরে কবির কেবল মনে হয়—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী,
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।—সারদামঙ্গল, ৩য় সর্গ

কবি বিহারীলালের সকল কাব্যেই এইরূপ বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব—এই স্বপ্ন ও সত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমারের কাব্যেও এইরূপ বাস্তব ও অবাস্তবের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কখনও তিনি কল্পনার উল্লাসে উৎফুল্ল। আবার কখনও বা বাস্তবের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইযাছে। অক্ষয়কুমারও বিহারীলালের মত একান্ত কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ কবি। এই কল্পনাবিলাস ও ভাবোন্মত্ততার জন্য তিনি বিহারীলালের মতই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

অচেনা জগৎ-বুকে অবরুদ্ধ সুখে-দুখে
কত ভুল করিযাছি, কত ভুলে ভুলিযা।
না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত
ফেলেছি, ঝটিকা মত, না জানি কি তুলিযা।
রবি, এও কি হয়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিযা?

—ভুল

নিছক কল্পনাবিলাসে ক্লান্ত হইয়া বিহারীলাল বলিযাছিলেন—

রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যকেই তিনি বরণ করিয়া লইযাছিলেন—

রহস্য মাধুরীমালা,
রহস্য রূপের ডালা,—
রহস্য স্বপন-বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে,
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

—সাধের আসন, ১ম সর্গ

বিহারীলালের মত অক্ষয়কুমার তাঁহার ভাবোন্মত্ততার জন্য আক্ষেপ করিলেও সেই কল্পনার স্বপ্ন তাঁহার কাছে মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

ঘুমঘোরে প্রায় ভোরে বাঁশীর গানটি যেন
ধরি ধরি না ধরিতে বেয়ে গেল রে।
একটি অবশ সুখ, একটি অলস দুখ,
একটি স্বপন, প্রাণ পেয়ে গেল রে! —ভুল

প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর। সেইজন্য কবি প্রত্যক্ষকে ঢাকা থাকিতে বলিতেছেন—

ফুটো না ফুটো না রবি থাক ঘোর ঘোর ছবি,
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন মদির মধুর।
নাহি শোক, নাহি তাপ, নাহি মোহ, নাহি পাপ,
কেটো না এ আবছা জাল, প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর।

—প্রদীপ, পৃঃ ৬৩

কবি বাস্তব-জগৎ হইতে দূরে—কল্পনার মেঘপুরে ছায়া ও স্বপ্নের মধ্যে বাস করিতে উৎসুক —

জগতের দূরে—তোর মেঘপুরে নিয়ে যা আমায়।
তোর ছায়া মত স্বপ্ন মায়া মত করে দে আমায়!

—কনকাঞ্জলি, পৃষ্ঠা ৬৮

কিন্তু এই স্বপ্নলোকে অধিকক্ষণ থাকিয়া তৃপ্তি পান না—তাঁহার অতৃপ্ত মন বাস্তবের আকুলতায় বলিয়া উঠে—

কাটে না গো দিন কল্পনার ঘোরে
আশায় আশায় যাপি',
তরুর তলায় নদীর কূলেতে
বুকেতে কুসুম চাপি',

কাটে না গো দিন বাজায়ে বাঁশরী
আপনার মনে গেয়ে,
আকাশের পানে সাগরের পানে
দিনরাত চেয়ে চেয়ে।

— কনকাঞ্জলি, পৃঃ ১১৪

কবিগুরু বিহারীলালের কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অক্ষয়কুমার ভাবের স্রোতে গা-ঢালিয়া দিয়া কখনও বা কল্পনার জগতে স্বপ্নের মেঘলোকে গিয়া পৌছিয়াছেন। আবার কখনও বাস্তবের মধ্যে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যে এই ধরণের ভাব ও কল্পনার মূলে বিহারীলালের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন বিহারীলালকে প্রকাশ্য ভাবে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহার কাব্যে বিহারীলালের মত আত্মভাববিভোরতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে আনন্দময়তা ও প্রীতিবিভোরতা বিহারীলালের কাব্যের মূলকথা উহা খুব বেশী পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

এ ভাঙা দেহমাঝে এ কি গো তামাসা।
ঢালিয়াছ এক রাশ প্রীতি ভালবাসা।
কবিত্বের অহঙ্কার হয়েছে মা চুরমার,
আমিত্ব ডুবিয়া গেছে প্রীতি-পারাবারে।

—অশোক গুচ্ছ, অদ্ভুত আলাপী

বিহারীলালে যে প্রীতিকল্পনার উন্মেষ হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল। খুব সম্ভবত বিহারীলালের প্রভাবেই দেবেন্দ্রনাথের কবিতাতে ভাববিলাসিতার আধিক্য ঘটিয়াছিল এবং বিহারীলালের মত তাঁহার কল্পনাবিলাসী মন বাস্তব হইতে বিমুখ হইয়া

পড়িয়াছে। বিহারীলালের কাব্যে যে সৌন্দর্যবিভোরতা আছে দেবেন্দ্র-নাথের কাব্যেও সেই বিহ্বলতা লক্ষিত হয়। কল্পনার সঞ্চারে কবির চিত্তে যে ভাব-সমাবেশ হয় তাহা বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—

অপরের চিত্তবনে ধীরে ফোটে ফুল—
ছিল যাহা পরাগের বেণু,
রবি-কর পিয়ে পিয়ে, হয় সে মুকুল,
সুধীরে প্রকাশে ফুল-তনু।
হায় কিন্তু মোর চিত্তে, হিমাদ্রি শিখরে যেন
অকস্মাৎ বসন্ত-সঞ্চার!
পল্লবে, মুকুলে, ফুলে, নুয়ে পড়ে তরুলতা!
মুহূর্তে একি গো রঙ্গ! মর্ম বোঝা ভার!

—গোলাপগুচ্ছ, কল্পনার প্রতি কবির উক্তি

এইরূপ সৌন্দর্যবিভোরতার মূলে বিহারীলালের প্রভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। দেবেন্দ্রনাথের প্রীতিমণ্ডিত সৌন্দর্য উপভোগের মূলে বিহারীলালের প্রভাব ছিল। কবির আরও অনেক কবিতাতেই এইরূপ ভাববিহ্বলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হইয়া কবি বলিতেছেন—

আহা কি মধুর রূপ! এই বেশে, হরি',
এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে!
হৃদয়ের অন্ধকার গেল সব সরি',
তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে।
পাগল চকোর সম, উধাও হইয়া,
পিব আমি, পিব আমি, ওরূপ-অমিয়া!

—গোলাপগুচ্ছ, চাঁদ

সাঁঝের প্রদীপ দেখিয়া কবির মনে যে সৌন্দর্যবিভোরতা সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসী।
হোলো মোর শয্যালয়, কুমুদ-কহ্লারময়
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী।
হের দেখ, হাসি হাঁসি, দিল মোর কাছে আসি,
এক রাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী।
অধর্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়,
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী!

—গোলাপগুচ্ছ, সাঁঝের প্রদীপ

এখানে শুধু সৌন্দর্যপিপাসার ধরণে নয়, ভাষাতেও বিহারীলালের সহিত আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

দেবেন্দ্রনাথ সর্ব বস্তুতে যে সৌন্দর্য দেখিয়াছেন তাহা বস্তুগত সৌন্দর্য নয়—বাস্তবই সর্বত্র তাঁহার কাব্যে অবাস্তব-মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রীতির উৎসমুখে সর্ববস্তুই সুন্দর। প্রীতি-সৌন্দর্যের এইরূপ মিলিত আবেগ—বাস্তবকে অবাস্তব-মনোহর কল্পনায় রসমণ্ডিত করিয়া দেখা—ইহা বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ উভয় কবিতেই বর্তমান। সৌন্দর্য উপলব্ধিতে পূজার একাগ্র ভাব উভয় কবির কাব্যেই দেখা যায়। তবে এই দুইজন কবির কল্পনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য শুধু এইটুকু যে সেই প্রীতি-সৌন্দর্যের মিলিত আবেগ বিহারীলালের ধ্যানকল্পনায় শান্তরস হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহা দেবেন্দ্রনাথের সর্বেন্দ্রিয় বিবশ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের "অশোক তরু" "অশোক ফুল" প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য।

বিহারীলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথও তাঁহাকে কবিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' 'বিহারীলাল' শীর্ষক

প্রবন্ধ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন—"বর্তমান সমালোচক এককালে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গলের' কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাষায় সর্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক। এই প্রসঙ্গে আমার সেই কাব্যগুরুর কাছে আর একটি ঋণ স্বীকার করিয়া লই। বাল্যকালে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটিকাটি প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।"

'সারদামঙ্গলে'র প্রথম সর্গে দেবী সরস্বতীর যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'র সরস্বতীর বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

> হৃদয়ে রাখ গো দেবি, চরণ তোমার।
> এস, মা করুণারাণী, ও বিধু বদনখানি
> হেরি হেরি আঁখি ভরি' হেরিব আবার।
> এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
> মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,
> আলোয় করেছ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা,
> তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্তি মধুরিমা।

—বাল্মীকি প্রতিভা

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনার সহিত কবি বিহারীলালের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা তুলনীয় —

এস মা উষার সনে
বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয় কমলে।

—সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ গীতি

অন্যত্র— এস মা করুণারাণী,
ও বিধু-বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভবি হেরি গো আবার,
শুনে সে উদার কথা
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।

—সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ

"বাল্মীকি প্রতিভায়" বাল্মীকি একস্থানে বলিতেছেন—

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসনা এসনা,
এসনা এ দীন জন কুটীরে।
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ হ'যে আছে ভোর,
আর কিছু চাহিনা চাহিনা।

এই উক্তির সহিত কবি বিহারীলালের ভাব ও ভাষাব মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিহারীলালও দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এসনা এ যোগী-জন তপোবন-স্থলে।— সারদামঙ্গল, ১ম সর্গ

"সারদামঙ্গলে"র দ্বিতীয় সর্গে প্রেমিকের নিবিড় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে সরস্বতীর প্রতি কবি তাঁহার বিবিধ অনুভূতি পর পর প্রকাশ করিয়াছেন। কখনো অভিমান, কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ, কখনো ভৎ'সনা, কখনো স্তব। কবি কখনও তাঁহাকে পাইয়াছেন—আবার কখনও তাঁহাকে হারাইতেছেন। এই প্রীতি-বিরহে প্রেয়সীরূপিণী সারদা প্রেমিক-কবির হৃদয়ে বিচিত্র সুখদুঃখের শতধারায় যে সঙ্গীত উৎসারিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভোগের অতৃপ্তি ও ত্যাগের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—

কেমনে বা তোমা বিনে দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে,
আর কার মুখ চেয়ে অবিশ্রাম যাব ধেয়ে,
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে।

রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'তেও সরস্বতী-বিরহের আশঙ্কায় বাল্মীকি যে উক্তি করিয়াছেন সেই অনুভূতিই বিহারীলালের কাব্যের উদ্ধৃত অংশে ধ্বনিত হইয়াছে। "বাল্মীকি প্রতিভায় "বাল্মীকি সরস্বতীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি, লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
"হা দেবী, হা দেবী" বলি, গুঞ্জরি, কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার আঁধার!

—বাল্মীকি প্রতিভা

এইরূপে দেখা যায় যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ও ছন্দের উপর বিহারীলালের অসীম প্রভাব ছিল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সকল কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভাব অনুযায়ী কাব্য রচনা করিলেও 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তিনি বিহারীলালের ভাষা ও ছন্দের প্রভাব হইতে নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার কাব্যরচনায় নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছেন তখনও বিহারীলালের কল্পনা ও ছন্দ মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বিহারীলাল রচিত 'বঙ্গসুন্দরী'র—

"সুঠাম শরীর পেলব লতিকা,
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।"

অথবা — একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এই ছন্দ তিন মাত্রামূলক। ইহার প্রথম প্রবর্তক কবি বিহারীলাল। এই ছন্দের সহিত রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতার ছন্দ তুলনীয়।—

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী
চরণপদ্মে নমস্কার
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
লও ফিরে তব পুরস্কার।

এই ছন্দের ব্যবহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—

"একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকিলে ধাবমান হওয়ার মত।" এই ছন্দসৃষ্টির প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিগুরু বিহারীলালের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ঐ ছন্দের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। 'বঙ্গসুন্দরীতে' বিহারীলাল যথাসাধ্য যুক্তাক্ষর করিয়া বর্জন এই ছন্দের মাধুর্য ও বেগবান্ গতির নৃত্য বজায় রাখিয়াছেন। যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে গিয়াই তিনি গোলে পড়িয়াছেন—তাঁহার ছন্দপতন হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ যখনই ব্যবহার করিয়াছেন তখনই যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণকে দুই মাত্রা ধরিয়া কাব্যরচনা করিয়াছেন। এই কারণে যুক্তাক্ষর থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কখনও ছন্দপতন হয় নাই—ছন্দ সত্যই বেগবান্ গতির নৃত্য যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নূপুর বাজাইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

বিহারীলালের কল্পনা অনেক স্থলেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কল্পনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনারতরী'র মূলে বিহারীলালের কল্পনা উৎস জোগাইয়াছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন—"খুব ছেলেবেলা কবি তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিকটে যাইতেন। বিহারীলাল গান রচনা করিতেন কিন্তু সুর দিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সুর যোজনা করিয়া বিহারীলালকে গাহিয়া শুনাইতেন। বিহারীলালের একটি গান রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগিয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরীর' আইডিয়া সেই গানটি হইতে পাইয়াছিলেন—

সোনার তরী নয়নে নাচে নাচে।
পা না দিতে দিতে ডুবে যে আচম্বিতে।

বাকী পদ রবীন্দ্রনাথের এখন আর মনে নাই। সেই গানটি হইতে

রবীন্দ্রনাথের মনে যে অস্পষ্ট আইডিয়া জাগিয়াছিল সেটি এমন একটি আদর্শ যাহাতে পা দিতে না দিতেই তাহা আচম্বিতে ডুবিয়া যায়, তাহার উপরে আমাদের পার্থিব জীবনের চাপ মোটেই চাপানো যায় না, অথচ তাহাকে না পাইলেও আমাদের প্রাণ বাঁচে না।

কবি যখন ভরা-পদ্মায় কাঁচা ধানে বোঝাই নৌকার ছবি দেখেন তখন তাঁহার মনে পড়ে সেই ছেলেবেলাকার সোনার তরীর কথা। সেই চোখে-দেখা ছবিকে দেহ করিয়া তাহার মধ্যে তিনি কানে-শোনা ভাবকে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দেন, এবং তাহারই ফলে জন্মলাভ করিয়াছে তাঁহার অপূর্ব সুন্দর কবিতা সোনার তরী।" 'সোনার তরী'—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র।

আত্মভাববিভোর কবি বিহারীলাল তাঁহার নিজের কবিচিত্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

না জানি কি ফুল দিয়া
গড়া, এ আমার হিয়া,
আপন সৌরভে কেন আপনি পাগল প্রায়।
কি কবি হেথায়। —সাধের আসন

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ কাব্যের 'মরীচিকা' কবিতার ("পাগল হইযা বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম—কস্তুরী মৃগসম।")—ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি যখন নিজের অন্তরলোকের সৌন্দর্য প্রকাশ করিবার উপযোগী ভাষা ও সুর খুঁজিয়া না পান তখন তিনি পাগল হইযা উঠেন। কবির সব চেয়ে বড় ব্যথা তাঁহার অন্তরলোকের ভাবসম্ভার প্রকাশ করার ব্যথা। উপলব্ধির যে আনন্দ কবির মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, অন্তরের সেই ভাবসম্পদকে সকলের গোচর করাই কবি-জীবনের সাধনা। এই আনন্দ ব্যক্ত করিতে না পারিয়া কবি

বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিজেদেরকে নাভীগন্ধে পাগল কস্তুরীমৃগের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এখানেও দেখা যাইতেছে যে কল্পনা-ভঙ্গীতে বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই সমধর্মী কবি।

বিহারীলালের ভাব ও কল্পনাদর্শের আভাস রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের 'চঞ্চলা' কবিতাতেও পাওয়া যায়। বিহারীলাল তাঁহার 'সাধের আসনে' বলিয়াছেন যে জগতের মধ্যে সর্বদাই পরিবর্তনের স্রোত চলিয়াছে। রূপান্তরের ফলেই নূতনের জন্ম হইতেছে। পরিবর্তনই এ জগতে সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিধান করিতেছে।—

উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।
আপনি সময় হ'লে
সূর্য চলে অস্তাচলে,
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন!
নিতি নিতি তরু লতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর!
ঝ'রে যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর!
বিশ্বের প্রকৃতি এই,
একেবারে লয় নেই,
এক যায় আর আসে
তরুণ সৌন্দর্যে ভাসে। —সাধের আসন

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চঞ্চলা' কবিতাতেও এই কথাই স্পষ্ট এবং সরস-সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। কালের কোনও মুহূর্ত স্থির হইয়া নাই, পরিবর্তনের প্রবাহ অদৃশ্য বেগে নিত্য-নিরন্তরই চলিয়াছে। সেই প্রবাহ-বেগে সবই ভাসিয়া যাইতেছে। এই গতিপ্রবাহ কোনরকমে স্থগিত হইলেই তৎক্ষণাৎ বস্তুস্তূপ জড়ো হইয়া উঠে। স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জড়ো হইয়া উঠিলে তাহার রূপের বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত 'বলাকা' কাব্যের মধ্যেই এই 'অকারণ অবারণ চলা'র, কথা আছে। থামিতে গেলেই—

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

এবং

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।

—বলাকা, চঞ্চলা

•

রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা), মুক্তি (নৈবেদ্য), মরীচিকা (কড়ি ও কোমল) প্রভৃতি কবিতার মূলেও বিহারীলালের কল্পনা অনুভূত হয়। ইংরেজ কবি শেলীর মত আদর্শ সৌন্দর্যের পূজারী হইয়াও মানুষকে যাঁহারা সুন্দর দেখেন বিহারীলাল তাঁহাদেরই একজন। কল্পনায় স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াও তিনি এক বিন্দু সুধা প্রাপ্ত হন নাই—

স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু
পাই নাই এক বিন্দু।—সাধের আসন

অমৃতাধিক ধন অশ্রু স্বর্গে নাই বলিয়া কবি অনুশোচনা করিয়াছেন এবং সেই অশ্রুকণাটুকু পাইয়া কবির মনে অসীম তৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছে—

তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত অধিক ধন
পেয়ে, এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল জীবন। —সাধের আসন

কল্পনায় স্বর্গের সুখচিত্র রচনা করিয়া কবি তৃপ্তি পান না। কারণ সেখানে সবই কামনাহীন। সেইজন্য কবি বলিয়াছেন—

যে যুগে তোমরা জাগ, সকলেবি জাগবণ,
এ যুগে নন্দন বনে সবে ঘুমে অচেতন।
আমাদের মর্ত্যভূমে
কেহ জাগে কেহ ঘুমে,
সূর্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয়।
এ চির পূর্ণিমা নিশি তেমন সুন্দর নয়।
—সাধের আসন, চতুর্থ সর্গ

স্বর্গেব সুখচিত্র অপেক্ষা পৃথিবীর চন্দ্রালোক ও সূর্যালোকের দৃশ্য কবির কাছে মধুবতর বলিয়া মনে হইয়াছে।, তিনি স্বর্গেব নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বপ্নের কল্পনায় ক্লান্ত হইয়া গাহিয়াছিলেন—"অমরের অপরূপ স্বপ্ন-সুখ নাহি চাই।" স্বর্গের অপরিবর্তনের স্রোত—সেখানকার চিরবসন্ত-কাল অথবা অনন্ত সুখের মধ্যে কবির ক্লান্তি আসে।—

এ চিরবসন্ত কাল
তেমন লাগেনা ভাল,

এবে যেন ভেঙে চুরে অন্য কিছু করা চাই।
অনন্ত সুখেরো কথা
শুনে প্রাণে পাই ব্যথা,
অন্—অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।
—সাধের আসন, চতুর্থ সর্গ

বিহারীলালের এই ধরণের কল্পনাভঙ্গীই আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথও বৈচিত্র্যহীন ও মায়ামমতাহীন স্বর্গ হইতে বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর মাতৃস্নেহক্রোড়কে অধিকতর লোভনীয় মনে করিয়া বলিয়াছেন—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

অন্যত্র— বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মতো
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল। শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন চেয়ে আছে।
—স্বর্গ হইতে বিদায়

বিহারীলালের মত রবীন্দ্রনাথও অশ্রুহীন স্বর্গ জীবনে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছেন।

কবি বিহারীলাল বলিয়াছেন—

দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,

আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার,—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ! —সারদামঙ্গল

রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ও কুসুমের কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া সুখশ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছে—

এসো ছেড়ে এসো, সখি, কুসুমশয়ন,
বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।
কতদিন করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুম-বনে স্বপন-চয়ন।

—কড়ি ও কোমল, মরীচিকা

কল্পনার ভঙ্গীতে উভয় কবির কাব্যের অনেক স্থলেই এইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিহারীলালকে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুইই সমানভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।—

কোথাগো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার।
যে রূপে নয়ন মন ভুলাতে আমার।
মানুষ স্থষ্টির সার, দেবতার অবতার,
ব্রহ্মাণ্ডের শিরোমণি প্রোজ্জ্বল ভূষণ !

—সারদামঙ্গল, ৪র্থ সর্গ

রবীন্দ্রনাথের কাছেও বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব এ দুইই সমান সত্য—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—কড়ি ও কোমল, প্রাণ

রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবজীবন সুন্দর ও বিরাট এবং অনন্ত অর্থপূর্ণ। বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব দুইই কবি-হৃদয়কে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার মধ্যে এই অনুভূতি কবির মনে জগিয়াছে।—

জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে বাঁধা আছি মোরা। —প্রকৃতির প্রতিশোধ

"কড়ি ও কোমলে"র 'মরীচিকা' কবিতার মধ্যেও কবির এই মানবপ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে—

চলো গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখে-দুঃখে যেথা সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি' ধরি' হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।

'মুক্তি' প্রভৃতি কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবেও এই ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি বিহারীলালের কাব্যের অনুশীলন করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। যে বালক রবীন্দ্রনাথ ভৃত্যরাজক-তন্ত্রের কঠোর শাসন এড়াইয়া খড়ীর গণ্ডীর বাহিরে যাইতে অক্ষম ছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয় বিহারীলালের কাব্য আস্বাদন করিয়া প্রকৃতির মাধুর্য উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি-পরিচয়ের মূলে বিহারীলালের কাব্য অনেকখানি প্রেরণা জোগাইয়াছিল। বাল্যে রবীন্দ্রনাথ 'পল্ বর্জিনী' পাঠ করিয়া পরম আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইতেন। বিশ্বপ্রকৃতি তখনও তাঁহার নিকটে অপরিচিত ছিল। সেইজন্য 'পল্ বর্জিনী'র সমুদ্র-তটের অরণ্য-দৃশ্যের বর্ণনা কবির নিকট অনির্বচনীয় সুখস্বপ্নের মত প্রতিভাত হইত। বিহারীলালের কাব্যও রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির সহিত মিলনের জন্য—প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—"পল্ বর্জিনীতে যেমন মানুষের এবং প্রকৃতির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম,

বিহারীলালের কাব্যেও সেইরূপ একটি ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" বিহারীলালের নিম্নোদ্ধৃত প্রকৃতি-বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বালক রবীন্দ্রনাথের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি বিশ্ব-চরাচরময় নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া কবি বিহারীলাল বর্ণিত প্রকৃতির সেই মাধুর্য উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেন।—

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নামধাম সকল লুকাই,
চাষীদের মাঝে র'য়ে,
চাষীদের মত হ'য়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।
প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্।
চারিদিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম,
সুস্থ স্ফূর্ত হবে কলেবর।
বাজাইবে বাঁশের বাঁশরী,
সাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি',
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্বরী।

রবীন্দ্রনাথ যদিও বলিয়াছেন যে তাঁহার মনে প্রকৃতির সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল—আদিম মানবপ্রকৃতি। কবি নহে।। তথাপি কবির অন্তরে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ রস গন্ধ গান উপলব্ধি করিবার ও তাহার মধ্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করিবার যে বাসনা সুপ্ত ছিল তাহাকে

উৎসারিত করিতে বিহারীলালেব কাব্য যে যথেষ্ট সহাযতা করিয়াছিল তাহা অস্বীকার কবিবাব উপায় নাই। উল্লিখিত বর্ণনার সহিত রবীন্দ্র-নাথেব 'বসুন্ধবা' কবিতাটির অনেক স্থলেই সাদৃশ্য আছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বচরাচরের বিচিত্র বর্ণনা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথেব 'চিত্ত অগ্রসরি' সমস্ত স্পর্শিতে চাহে।"—

সমুদ্রেব তটে—
ছো'টা ছোটো নীলবর্ণ পর্বত-সঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তবী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে কোনোমতে
আঁকিযা বাঁকিযা। ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্মি মুখরিত
লোকনীডখানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধবি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে আপনাব করি
যেখানে যা কিছু আছে।—

—বসুন্ধরা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি কবিবার ব্যাকুলতা বিহারীলাল অপেক্ষা নিবিড়তব হইযা প্রকাশ পাইযাছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সীমার বাঁধ ভাঙিয়া অসীমেব বুকে নিজেকে ব্যাপ্ত করিবাব আকাঙ্ক্ষা বঙ্গসাহিত্যে বিহারীলালের কাব্যেই সর্বপ্রথম ফুটিযাছিল। উহাই রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলে উৎসরূপে প্রেরণা জোগাইযাছে। সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমাগত অসীমের সহিত মিলনের উদগ্র বাসনা—যাহা রবীন্দ্রকাব্যের মূলকথা উহা রবীন্দ্রনাথ তাঁহাব গুরু বিহাবীলালের সমস্থত্রে

প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবি নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।— "যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে বিহারীলালের ছন্দেই সেই ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।"—

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যথা যেন গর্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘ সঙ্ঘ,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জিয়া বেলারে।
সম্মুখেতে অসীম অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার,
উত্তাল তরঙ্গ সব
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার

* * *

সেই মহা রণস্থলে
স্তব্ধ হ'য়ে বসিয়ে বিরলে,
দেখিগে শুনিগে সে সকল।

বিহারীলালের এই শ্রেণীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের মনে অসীমের সহিত মিলনের নিবিড় আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিল।

কবি বিহারীলাল কখনও ভাবাবেগে বিহ্বল—ভাবাবেগে আত্মনিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। আবার কখনও বাস্তব বা রূপজগতের সম্মুখীন হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন। কবির 'সারদামঙ্গলে' রূপ হইতে ভাবে প্রত্যাবর্তনের কথা অনেক স্থানেই আছে।—

রূপের ছটায় তুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি-যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার।
অমনি স্বপন-প্রায়
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়
চমকি' আপন পানে চাহেন রূপসী,
চমকে গগনে তারা
ভূধরে নির্ঝর ধারা,
চমকে চরণ-তলে মানস সরসী।

অন্যত্র—

তোমারে হৃদয়ে রা'খি'
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে।

অথবা—

থাক হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভ'রে রাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর কোলাহলে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এইরূপ 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা'র তত্ত্ব অপূর্ব রসস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনাদর্শের মূলেও বিহারীলালের কল্পনাভঙ্গী ছিল বলিয়াই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কবিতাতে বিহারীলালের কাব্যসাধন-রীতি অপূর্ব

ছন্দে বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত কবিতায় কবি ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত আদর্শের একটি গভীর উপলব্ধি ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন।

'চিত্রার' প্রথম স্তবকে তিনি নিখিল কাব্যকলা বা কবিকল্পনার প্রেরণারূপিনী সৌন্দর্যদেবতার বন্দনা করিয়াছেন —

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

*　　*　　*

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী।

এই 'চিত্রা' কবিতারই দ্বিতীয় স্তবকে কবি এই সৌন্দর্যদেবতাকে কাব্যকলা হইতে বিযুক্ত করিয়া, নিভৃত অন্তরমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবির যে ভাবাবস্থা হয় তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন —

অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল-নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির যামিনী।

এই দ্বিতীয় স্তবকে কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বহির্মুখী নহে—অন্তর্মুখী। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে যে ধ্যানমন্ত্রে আরাধনা করিয়াছেন সে মন্ত্র একান্তভাবেই বিহারীলালের। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সৌন্দর্য-কল্পনাকে বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া মনোজগতে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। বহির্জগত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত বলিয়া অন্তর্জগতে কোনও চঞ্চলতা নাই,—আছে কেবল সৌন্দর্যবোধ, প্রীতি, মধুরতা এবং ভাবনিমগ্নতা। কবি এখানে অন্তর্মুখী কল্পনাকে বহির্মুখী কল্পনা হইতে বড করিয়া দেখিযাছেন। 'চিত্রার' প্রথম স্তবকে কবি জগতের বৈচিত্র্য হইতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে কাব্যরস অথবা সৌন্দর্যবোধ আহরণ করিতে চাহিয়াছেন উহা সদা-চঞ্চল, অশান্ত তাহার স্বভাব। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে বাহিরের রূপ রস বর্ণ গন্ধ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি অনুভূতির আনন্দ একটা স্থির শান্ত অচপল রূপ ধারণ করিযাছে। সেখানে প্রকাশ পাইযাছে কেবল কবির অন্তরের আনন্দের অনুভূতি। ইহা একটি ধ্যানের অবস্থা—যোগের অবস্থা—একটি পূজার একাগ্র ভাব।

কবি বিহারীলালের সারদাও আদর্শ সৌন্দর্যলক্ষ্মী। তিনি এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে অন্তরমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধকের মত তন্ময় হইয়া ভাবাবেগে আত্মবিভোর হইয়া সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির সারদা বিশ্বব্যাপিনী অথচ অন্তরবাসিনী। বিভিন্ন আকারে বিভিন্নরূপে মনের ও বাহিরের জগতে তিনি বিকশিত হইতেছেন। কখনও তিনি জননী, কখনও কন্যা, কখনও প্রেয়সীরূপিনী। তবে বিহারীলালের কাছে সারদার অন্তরবাসিনী রূপটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সারদার রূপের বিচিত্রতার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার অবকাশ তাঁহার বিশেষ হয় নাই। রবীন্দ্র-নাথের কাব্যলক্ষ্মী শুধু "অন্তরমাঝে একা একাকী" নহেন। জগতের মাঝেও তিনি "বিচিত্ররূপিনী।" কিন্তু বিহারীলালের ধ্যানপরায়ণ একনিষ্ঠ হৃদয়

এই বিচিত্ররূপিনীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। বিহারীলালের কাব্যলক্ষ্মী 'অন্তরবাসিনী' হইয়াই রহিলেন। বিহারীলাল আপনার ভিতর আপনি আত্মসমাহিত। তিনি এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী আর রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রতাবাদী।

বিহারীলাল সর্বত্রই তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে তাঁহার অন্তরমাঝে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিয়াছেন। সেখানে সাধকের যোগের অবস্থা এবং পূজার একাগ্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে —

মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী।
তুমি সাধকের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে।

—সারদামঙ্গল

বিহারীলাল সারদাদেবীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যমূর্তিটি বিধাতার 'মানস-সরে'ই প্রকাশমান দেখিতে পান। কারণ সৌন্দর্যবোধ সেখানে শান্ত, অচপল রূপ ধারণ করিয়াছে —

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর স্বুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি, হাসি, ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।

—সারদামঙ্গল

সারদামঙ্গলের সর্বত্রই কাব্যলক্ষ্মীর এই 'অন্তরবাসিনী' রূপটি উপলব্ধি করিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—

হৃদি-কমল বাসিনী কোথারে আমার!

অন্যত্র— হৃদয়-প্রতিমা ল'যে

থাকি থাকি সুখী হ'য়ে,

অধিক সুখেব আশা নিরাশা শ্মশান।

ভক্তিভাবে সদা স্মবি,

মনে মনে পুজা কবি,

জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে কবি দান।

* * *

বিচিত্র এ মত্তদশা,

ভাবভবে যোগে বসা,

হৃদযে উদাব জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!

'সাধেব আসনে'ও কবি সেই কাব্যলক্ষ্মীকে সম্বোধন করিযা বলিতেছেন—

তোমারে হৃদয়ে রাখি',

সদাই আনন্দে থাকি,

আমার প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয সাবা দিবা বজনী।

বিহারীলালের কাব্যের সর্বত্রই কবি তাঁহার এই মানস-প্রতিমা কাব্য-সবস্বতীব আরাধনা কবিয়াছেন তাঁহার মনোজগতে। সেইখানে তিনি তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্যজগতকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। সেখানে কবিব আনন্দানুভূতির গোপন পূজা চলিয়াছে। কবি যেখানে এইরূপ বহির্মুখী চেতনা হইতে আত্মচেতনায ফিরিযা আসিযাছেন সেইখানে তাঁহার সহিত ববীন্দ্রনাথের কল্পনার সাদৃশ্য। এই ধবণের কল্পনাভঙ্গী প্রথম ফুটিয়াছিল বিহারীলালের কাব্যে। তবে রবীন্দ্রনাথ আর্টিষ্ট কবি—তাঁহার সদাজাগ্রত চৈতন্য রূপজগতেব বিচিত্রতাব দিকে যেমন দৃষ্টিপাত কবিযাছে, তেমনি আবাব বিহারীলালের মত আপনার মনোজগতে সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীব প্রতিষ্ঠা

করিয়া সেই রূপও অনুভব করিয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল একান্তভাবেই মিষ্টিক কবি। তিনি আপনার উপলব্ধিতে আপনি মগ্ন। এইখানে দুই কবির কল্পনায় প্রভেদ। বিহারীলাল কেবল সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রূপে মুগ্ধ। তাঁহার মুগ্ধ কবিহৃদয় কেবল সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াই উল্লসিত —ঐ সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন—

মধুর মাধুরী-বালা,
কি উদার করে খেলা।
অতি অপরূপ রূপ!
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।

—সাধের আসন

অন্যান্য গীতি কবিদের উপর বিহারীলালের প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও কবি হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে তিনি খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। আধুনিক গীতি-কবিতার যুগে তাঁহার কাব্যের নিরিখ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। বিহারীলালের কাব্য-প্রেরণা ছিল সবল এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "ইংরেজি সাহিত্যে পোপ কবির আবির্ভাবের পর কবিতা-সাম্রাজ্যে যে একটা পেশা-দারী ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল, ক্র্যাব ও কাউপারের আবির্ভাবে সেইটি খণ্ডিত হইল, পরে কীট্‌স্ বায়রণ শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই পেশাদারী ভাবের খণ্ডন-ব্যাপারের চূড়ান্ত করিয়া দেন। বঙ্গ-কবিতা-রাজ্যে বিহারীর আবির্ভাব কতকটা সেইরূপ। পেশাদারী কবিতার লেশমাত্র তাঁহার প্রতিভাতে ছিল না। যাহা তিনি নিজে দেখিতেন শুনিতেন বা অনুভব করিতেন, যেন কোন এক দুর্দম প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবর্তিত করিত। যে শব্দটি তাঁহার মনের

ভাবের প্রখরতা-ব্যঞ্জক হইত এবং আপনা হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাষা হউক, অপভ্রংশ হউক, তিনি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।"

বিহারীলাল ছিলেন গীতিকবি। কিন্তু গীতিকবি হইলেও তাঁহার কল্পনায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টতা ছিল যে সেগুলি লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না। তিনি ছিলেন আত্মনিমগ্ন কবি—তাঁহার কাব্যে ভাবের ঐকান্তিকতা ও গভীরতা যতটা হৃদয়গ্রাহী, ভাবেব মূর্তি ততটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। বাহিরের বস্তুকে গীতিকবি নিজস্ব ভাবকল্পনায মণ্ডিত করিয়া যে একটি বিশেষ রূপ ও রসেব সৃষ্টি করেন, গীতিকবি হইলেও তাঁহার কবিপ্রতিভা তাহা হইতেও বিভিন্ন। কবি নিজেব আনন্দে নিজেব ধ্যানকল্পনার আবেশে সর্বত্র নিছক ভাবেরই সাধনা করিয়াছেন। কবি বিহারীলালের কবিপ্রকৃতিতে সে ধরণের উন্মাদনা—কবি কীট্‌স্‌ যে কবিস্বপ্নকে—

Upon the night's starred face,
Huge cloudy symbols of a high romance

বলিযাছেন, সে ধরণের রূপরসের উৎকণ্ঠা তাঁহার ছিল না। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয তাঁহাব "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" নামক পুস্তকে অতি অল্প কথায় বিহারীলালের কাব্যেব স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—"ভাবনা অপেক্ষা ভাব, কল্পনা অপেক্ষা প্রীতিবিভোরতা, যাহা নাই তাহার উদ্‌ভাবনা অপেক্ষা যাহা আছে তাহার দ্বারা আনন্দলোক বিরচন—ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশিষ্টতা।" কল্পনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গী ও অভিনবত্ব প্রকাশ পাইযাছে তাঁহার "সারদামঙ্গল" কাব্যে ও "সাধের আসনে"।

"সারদামঙ্গল" কাব্যে কবি বিহারীলালের অপূর্ব কবিকীর্তি। "সারদা-

মঙ্গল”খানিকে সমগ্র কাব্য হিসাবে পাঠ করিলে একটা সুসংলগ্ন অর্থ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাকে কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে অর্থবোধ করা দুরূহ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাষ দেয় কিন্তু কোনও রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব-রাগিনী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।” কবির সারদা সরস্বতী বটে—আবার নাও বটে। কারণ সরস্বতী সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করি সেই ধারণার সহিত কবি বিহারীলাল-কল্পিত সরস্বতীর সাদৃশ্য নাই। কবি “সারদামঙ্গলে” যে সরস্বতীর জয়গান করিয়াছেন সে সারদা কখনও জননী, কখনও বা প্রেয়সী আবার কখনও কন্যারূপিনী। তবে এক কথায় সারদার কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে তিনি হইতেছেন বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী। সৌন্দর্যরূপে তিনি জগতের সর্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং দয়া স্নেহ প্রেম প্রভৃতির দ্বারা মানুষের চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলিকে নিরন্তর বিচলিত করিতেছেন। কবির সারদা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিসর্বস্ব বিশ্বচেতনা নহে—অথবা শেলীর রূপাতীত রূপময়ী প্রেম-সৌন্দর্যের আদর্শ লক্ষ্মীও নহে। কবি কীটসের Principle of Beauty in all things—এই ধারণা কবি বিহারীলাল খানিকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেইজন্য সৌন্দর্য তাঁহার কাছে বাস্তবাতীত বা রূপাতীত নহে—জাগতিক সকল বস্তুতেই তিনি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন। তাঁহার কাছে জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে একটি সৌন্দর্যতত্ত্ব। তাঁহার সারদা প্রত্যক্ষে বিরাজমানা—তিনিই বিশ্বব্যাপিনী—

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,

কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

'যোগীব ধ্যান' ও 'প্রেমিকের প্রাণ'—তাঁহার সারদায় এ দুইয়ের কোনও বিরোধ নাই। কারণ প্রেম ও সৌন্দর্যপিপাসা তাঁহাব নিকট অভিন্ন।

বিহারীলাল তাঁহার সাবদাকে যে আদর্শ কল্পনায় মণ্ডিত দেখিযাছেন তাহাব সহিত শেলীব Archetypal Beautyব একটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইতে পাবে। কিন্তু বিহাবীলাল সমস্ত বস্তুজগতকে Idealise করিলেও কোথাও তাহাকে অস্বীকাব করেন নাই। বরং বরাবরই বলিযাছেন যে সেই কান্তিদেবতা শুধুই বিশ্বের আলো নয—তিনিই বিশ্বরূপিনী।

শেলী আইডিযাকেই শরীরিণী দেখিতে চাহিযাছিলেন—

In many a mortal forms I rashly sought
The shadow of that idol of my thought

এবং পরিশেষে হতাশ হইযা এই কায়াকে বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি এই বহু ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার কবিয়া গাহিয়াছিলেন—

The One remains, the many change and pass
Heaven's light for ever shines, Earth's shadows fly
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragments.—Die,
If thou wouldst be with that which thou dost seek.

বিহারীলাল শেলীব মত এই কায়াকে বাদ দিযা শুধু কান্তিটুকু কুচাহেন না। তিনি বলেন—

মহাপ্রলয়ের কথা
কি বিষম বিষণ্ণতা,
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে
অনুভবে আসে না।

কবি কীট্‌স্‌ নিছক সৌন্দর্যসাধনায় ক্লান্ত হইয়া যাহাদের স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—They seek no wonder but the Human Face—কবি বিহারীলাল আদর্শ সৌন্দর্যের পূজারী হইয়াও তাঁহাদেরই একজন। একান্ত কল্পনাপ্রবণ কবি হইলেও বিহারীলাল কখনও বাস্তবজীবন ও জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। বাস্তবের মধ্যেই তিনি অবাস্তবের সন্ধান করিয়াছিলেন। এইখানেই শেলীর সহিত তাঁহার সৌন্দর্যসাধনার বিভিন্নতা। শেলীর ছিল Transcendental Idealism—অর্থাৎ তাঁহার ধারণায় কান্তি বিশ্বকে Transcend করিয়া আছে। তাঁহার Hymn to Intellectual Beauty কবিতায় তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে সেই আদর্শ-সৌন্দর্য মানবচিত্তের চিরকাল অনায়ত্ত। কিন্তু বিহারীলাল হৃদয়ের প্রেমমার্গ দিয়া আদর্শ সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাগতিক বস্তুর মধ্যেই তিনি সারদার সৌন্দর্য দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে সারদার কান্তি, মূর্তি ও শোভাসম্পদ সকল কিছু জাগতিক বস্তুর মধ্যেই রহিয়াছে। বিহারীলাল বুঝিয়াছিলেন যে বাস্তবের অনুভূতির উপরেই অতীন্দ্রিয় জগতের শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। বিহারীলালের এই ধরণের ভাবসাধনার মূলে আছে মর্ত্যমাধুরীলুব্ধ কবিপ্রাণ। তাঁহার কবিতায় ভাবাবেশ ও স্বপ্ন আছে—কিন্তু এই ভাবাবেশ ও স্বপ্ন কবির বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মর্ত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার এই আকাঙ্ক্ষা বিহারীলালের কাব্যে যে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। বিহারীলালই বঙ্গসাহিত্যকে

আধুনিক কল্পনায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে আধুনিকতার যে সকল লক্ষণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে উহাই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণা লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নব-গীতিকাব্যের প্রকাশ ও উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। গীতিকাব্যের ভাষা হয় স্বাভাবিক—ভাবও কবির প্রাণের ভিতর হইতে উৎসারিত হয়। এই স্বাভাবিক ভাষা ও প্রাণের ভিতর হইতে উৎসারিত ভাব বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। Subjective কল্পনার উন্মেষও বিহারীলালের কাব্যে প্রথম দৃষ্ট হয়। তাঁহার কল্পনাভঙ্গী ও বর্ণনারীতি সমস্ত মিলিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের নব-অরুণোদয় সূচিত করিয়াছিল।

সাহিত্যে শরৎচন্দ্র

আধুনিক কালে মানব-জীবনের ও মানব-মনের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ উপন্যাসেই হইয়াছে। বর্তমান যুগের উপন্যাস মানবের ভাবাবেগের রাজ্যে আপনাকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া এখন বুদ্ধি ও চিন্তার জগৎ জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছে। মানব জীবনের যে বিচিত্র ও বহুমুখী গতি, তাহার প্রকাশ একমাত্র উপন্যাসেই সম্ভব। যে সংশয় ও সন্দেহ, যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও নিরাশা চিরদিন ধরিয়া মানবজীবনে প্রবাহিত হইতেছে, সাহিত্যে আমরা এই সমস্তেরই ছায়া দেখিতে পাই। জীবনের এই অনন্ত প্রকাশকে যাঁহারা রূপ দিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র একজন। জীবনের সহজ প্রকাশ তাঁহার সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেখানে সুখও আছে দুঃখও আছে, কিন্তু সে সুখ-দুঃখ বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগত জীবনেরই সুখ-দুঃখ। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ছবিও তিনি আঁকিয়াছেন কিন্তু মানব-জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও তাহার ব্যক্তিত্বও তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে।

সমাজ ছাড়িয়া সাহিত্য হয় না। মানুষ সমাজের অঙ্গ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ ও তাহার জীবনের গতিবিধি সমাজের সহস্র বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাতে মানব-মনের যে কিরূপ অন্তর্দাহ ও

দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তিনি খুব নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন। ব্যক্তির উপর সমাজশক্তির বিচারবিহীন পীড়ন আর সমাজের মঙ্গলহীন নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার বিদ্রোহ তাঁহার সাহিত্যের প্রধান ধারা।

বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান একটু স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আদর্শবাদী। জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি, তাঁহার উপন্যাসগুলিকে বিশেষ ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া সেই সব উপন্যাসে কোথাও বা গীতিকাব্যের উন্মাদনা কোথাও বা মহাকাব্যের বিশালতা আনিয়া দিয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টিতে যাঁহাদের দৃষ্টি type সৃষ্টিতে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক। তাঁহার ভ্রমর, কপালকুণ্ডলা, আয়েষা, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ প্রভৃতি চরিত্র বাস্তব জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের আদর্শ দ্বারা গঠিত। তিনি তাঁহার আয়েষাতে মানবতার একটি type সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই চরিত্রটি করুণাময় কোমল এবং তেজে প্রদীপ্ত। তাঁহার সৃষ্ট পুরুষ বা নারী-চরিত্রের ভিতর দিয়া ঠিক এইরূপ এক একটি বিশেষ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাসৃষ্ট রোমান্স্ তাঁহার অন্তরের আদর্শ অনুযায়ী হইলেও একেবারে অপ্রাকৃত হয় নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহে একটা স্পষ্ট আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ও বাস্তব জীবনের সহিত গূঢ় সংযোগ আছে। এইখানে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথেরও অসামান্য কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" ও "ঘরে বাইরে"র মত উপন্যাস আমাদের দেশের গৌরব, এবং আমাদের দেশে ঐ উপন্যাসের প্রভাব অসীম। উপন্যাস লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতম সমস্যাগুলি

বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; মনোবিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসারে চরিত্র বিশ্লেষণের পরিকল্পনা তিনিই প্রথম আমাদের সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই পথে অগ্রসর হইয়া শরৎচন্দ্রও উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন।

সাহিত্য জাতীয়-জীবনের আলেখ্য। যে-কোনও জাতির সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সাহিত্যে। প্রত্যেক জাতিরই একটা দর্শন আছে। কিন্তু দর্শন পথ প্রদর্শন করে না, শুধু প্রণালী নির্দেশ করে। কর্মের প্রেরণা দেয় আর এক বস্তু—সেটি হইতেছে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা। জাতীয় সাহিত্য এই আশা আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। ফরাসীর বিখ্যাত বিপ্লব ইউরোপের সাহিত্যকে যেরূপ একটি বিশিষ্ট ভাবধারায় চালিত করিয়াছিল, এবং গত মহাযুদ্ধ পৃথিবীর অনেক দেশের সাহিত্যেই যেরূপ একটা প্রবল আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে, বাংলা-সাহিত্যে সেরূপ কোন উপলক্ষ্য ঘটে নাই। সাহিত্যিকের প্রতিভাই বাংলা-সাহিত্যে নূতন ধারা প্রবর্তিত করিয়াছে। শরৎচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে "নব যুগের প্রবর্তক" বলা হইয়াছে। সাহিত্যে যাহারা এতকাল ধরিয়া অপাংক্তেয় ছিল তাহাদের তিনি তাঁহার উপন্যাসসমূহে স্থান দিয়াছেন। যাহাদিগকে পতিত বলিয়া সমাজ এতকাল দূরে ঠেলিয়াছে তাঁহাদের ভিতরেও যে ঋষি বিবেকানন্দের নির্দিষ্ট "নর-নারায়ণের" সাড়া মিলিতে পারে এ শিক্ষা কাউণ্ট্ টলষ্টয় কর্তৃক বহুদিন পূর্বে বিঘোষিত হইলেও বাংলার পক্ষে অত্যন্ত নূতন। রসসৃষ্টির এক নূতন প্রতিভা লইয়া শরৎচন্দ্র এক নূতন পথে অগ্রসর হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় গতানুগতিকতা নাই এবং তাঁহার রচনা সহজ সৌন্দর্যে পরিপুষ্ট।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সরল দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি একটা করুণ ও গভীর সহানুভূতির সাড়া আমরা পাইয়াছি, তাহাদের জীবনের উদারতা ও ভাবসমৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা আমাদের জন্মিয়াছে। সমাজের

অবজ্ঞার পাত্র-পাত্রীকে তিনি সম্মানিত করিয়াছেন। পতিত বলিয়া বঙ্গ-সমাজ যাহাদের অবজ্ঞা করিয়া থাকে, শরৎচন্দ্র বলিলেন, তাহাদের কি হৃদয় নাই, না, তাহারা ভালবাসিতে জানে না। সমাজের এবং অদৃষ্ট-চক্রেই তাহারা এই, নহিলে তাহাদেরও মন আছে, আত্মা আছে, তাহাদের জীবন একেবারে ব্যর্থ নয়।

শরৎচন্দ্র রূপকার। অসুন্দরের মধ্যেও তিনি সুন্দরের উজ্জ্বল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মন্দিরে সকলেরই স্থান আছে, সুন্দর বা ছোট বলিয়া কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন নাই। তাঁহার কাছে মানুষের অন্তরজগতই সব-চেয়ে বড। বাহিরের দীনতা যে মানুষের প্রকৃত রূপ নহে তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। নীলাম্বরের মত নিরক্ষর গাঁজাখোর পল্লীসন্তানের মধ্যে রসের উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ধান করিতে তাঁহার সাহসের অভাব হয় নাই। কিংবা পতিতা রমণীর কাহিনী বিবৃত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

রূপ ও রসেই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যিক রসের সন্ধান পান মানুষের অন্তরে। এই রসকে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া শরৎচন্দ্র দ্রষ্টা, আর রসকে রূপ দিয়াছেন বলিয়া তিনি স্রষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্র idealist বা আদর্শবাদী নহেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ realist বা বাস্তবপন্থী। বাস্তবপন্থী বলিতে যদি বোঝা যায় যে বাস্তব জগতের বাস্তব নরনারী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সাহিত্য এবং তাহাদের প্রকৃত সুখদুঃখের বর্ণনাই তিনি করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি বাস্তবপন্থী। কিন্তু বাস্তবপন্থী বলিতে আমরা যদি মনে করি যে কেবলমাত্র দৈনিক জীবনের হুবহু ছবিই তিনি আঁকিয়াছেন—আমরা প্রতিদিন যাহা দেখি কেবলমাত্র তাহাকেই তিনি তাঁহার সাহিত্যে প্রতি-বিম্বিত করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে বাস্তবপন্থী বলিলে তাঁহার উপর অবিচার

করা হইবে। কোনো সাহিত্যিকই এই অর্থে বাস্তবপন্থী হইতে পারেন না। একটি কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে Idealism ও Realism এই দুইয়েরই মূলে রহিয়াছে রসবোধ। এইখানে আসল সাহিত্য-স্রষ্টার পরিচয়। বাস্তবকে রসোপযোগী করিয়া সাজাইয়া না লইতে পারিলে সাহিত্য বা কাব্য হয় না। যিনি খুব বেশী বাস্তবপন্থী তাঁহাকেও রসসৃষ্টি করিতে হইবে। সৃষ্টি করা অর্থ হইতেছে এই যে, চিরকালের এই প্রত্যক্ষ জগতের পুরাতন ঘটনাগুলিকে নূতন চোখে দেখা এবং নূতন করিয়া রূপ দেওয়া। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের অসম্বদ্ধ প্রকাশকে সাহিত্যের উপযোগী করিয়া সাজাইয়া তুলিতে হইবে। কেবলমাত্র নকল করিলেই যদি সৃষ্টি হইত তাহা হইলে ফটোগ্রাফই আর্ট বলিয়া গণ্য হইত, বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর কল্পনাপ্রসূত চিত্রসমূহের কোনো প্রয়োজনই থাকিত না। প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া নহে বলিয়াই আর্টকে আর্ট বলা হয়। এই সম্পর্কে বিখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—"জগতে আমরা যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার কোনটাই হুবহু নকল করা সম্ভব নহে, সম্ভব হইলেও সেই অনুকরণকে শিল্পীর নৈপুণ্যের আদর্শ বলা চলে না। প্রত্যেক রূপ একটি ভাবের সহিত মিশ্রিত থাকে। সেই ভাবের আভাস বা প্রত্যক্ষ প্রকাশ শিল্পের প্রধান অঙ্গ। ফুলটি আঁকা তখনই সার্থক যখন শিল্পী তাঁহার চিত্রিত ফুলটির মধ্যে স্বাভাবিক ফুলের ভাব-মাধুর্যের ইঙ্গিত করিতে পারেন।" সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষেও এই কথাটি বেশ খাটে। সাহিত্যিক যে চরিত্রটি আঁকিবেন সেই চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও তাহার অন্তরের বিশেষ ভাবটিকে প্রকাশ করেন। সাহিত্যিক ভাবের চিত্র আঁকিতে যতটা যত্নপর বস্তুর চিত্রাঙ্কণে তাঁহার ততটা প্রয়োজন নাই। শরৎচন্দ্রও এই ভাবে মানুষের মনের দ্বন্দ্ব আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি পরিস্ফুট করিয়া তাহার

আসল রূপটিকে রসবোধের দ্বারা পরম সহানুভূতির তুলিকায় আঁকিয়াছেন।

বাস্তবপন্থী হইলেও তাঁহার মন কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়াছে। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ ও সহানুভূতি এত বেশী যে সকল কিছুকেই তিনি খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা সামান্য তাহা শরৎচন্দ্রের কাছে অ-সামান্য বলিয়া মনে হইয়াছে। মানুষের দুঃখ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বেশী উপলব্ধি করিয়াছেন—এই উপলব্ধিই তাঁহার কবিশক্তি। চাঁদের দিকে চাহিয়া তিনি কাহারও মুখ দেখিতে পান নাই একথা মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি কবি এবং তাঁহার মন কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়। "শ্রীকান্তে" রাত্রির বর্ণনা এবং সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনায় আমরা তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তারপর জীবনের ছোটখাট তুচ্ছ জিনিসের দিকে চাহিয়া তিনি কবির দৃষ্টিতে এমন অনেক কিছু দেখিয়াছেন যাহা অতি তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিবিশিষ্ট কবি ছাড়া আর কেহ কখনো দেখিতে পান না।

তাঁহার "একাদশী বৈরাগী"তে মানব মনের একটি আশ্চর্য অসঙ্গতির উদাহরণকে তিনি যেরূপ কৃতিত্বের সহিত ধরিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। একাদশী চক্ষুলজ্জাহীন সুদখোর, সে একপয়সাও সুদ ছাড়িতে চায় না। ইহার কাছে গ্রামের যুবকদল যখন চাঁদা আদায় করিতে গেল তখন চারি আনা চাঁদা দেওয়াই তাহার চরম দানশীলতা। কিন্তু এ পাষাণ-হৃদয় লোকটির অন্তরের এক পাশে যে মহত্ত্ব নিহিত ছিল তাহার পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। তাহার পদস্খলিত ভগ্নীর প্রতি একাদশীর অসীম স্নেহ ছিল, আর অর্জিত অর্থ সম্বন্ধে তাহার অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মজ্ঞান ছিল। যাহার মন একদিকে অত নীচ অপর দিকে তাহা কি মহান্। এইখানেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির বিশেষত্ব। নীচের মধ্যে

মহত্ত্বের যে বীজ নিহিত থাকে তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় না। "বৈকুণ্ঠের উইলে" গোকুলের বাহ্যিক কর্কশ ভাবের অন্তরালে যে মাধুর্য ও স্নেহকোমলতা রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হই।

সাহিত্য-শিল্পী বাস্তবপন্থী হইলেও তিনি যখন একটা পরিপূর্ণ শিল্প-সৃষ্টি খাড়া করেন তখন সেইটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র জগৎ হইয়া দাঁড়ায়। তখন সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠিত সেই জগতের চরিত্রসমূহ আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের মানুষের সহিত ঠিক ঠিক মিলিল কি না সে প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয় না। তর্ক করিয়া উপন্যাসের চরিত্রকে অস্বাভাবিক প্রতিপন্ন করিলেও পড়িবার সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে না। রাজলক্ষ্মীর মত বাইজি এবং সাবিত্রীর মত মেসের ঝি পৃথিবীতে আছে কি না সে সম্বন্ধে অনেকে হয়ত আলোচনা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা দিয়া ঐ সব চরিত্রের বাস্তবতার বিচার হইবে না। দেখিতে হইবে যে শরৎচন্দ্র তাহাদের চারিদিকে যে আবহাওয়া ও ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে এ ধরণের চরিত্র গজাইয়া উঠিতে পারে কি না। এই দিক হইতে চরিত্রের বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিচার করিতে হইবে। বাস্তব জগতের সত্য ও সাহিত্য-জগতের সত্য এক পদার্থ নয়—একটিকে বলা যায় fact, অপরটি truth—একটি তথ্য, অপরটি সত্য।

সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্র একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, দার্শনিক যুক্তি দ্বারা নহে, আর্টিষ্টের রসবোধের দ্বারা। কারণ সাহিত্য-জগতে সত্য কথাটির অর্থ একটু ব্যাপক। আমাদের ধারণা এই যে সাধারণত আমরা যাহা দেখি শুনি তাহাই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। কিন্তু ঠিক এই অর্থে সাহিত্য-জগতে সত্য কথাটি ব্যবহৃত হয় না। যাহা ঘটিতে পারে এবং ঘটিলে সৃষ্টিলীলা আরও অধিক সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়া

উঠে তাহাই সাহিত্যিক সত্য। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক হাড্‌সন বলিয়াছেন—

"By poetic truth we do not mean fidelity to facts in the ordinary acceptation of the term Such fidelity we look for in science By poetic truth we mean fidelity to our emotional apprehension of facts, to the impression which they make upon us, to the feelings of pleasure or pain, hope or fear, wonder or religious reverence, which they arouse Our first test of truth in poetry, is its accuracy in expressing, not what things are in themselves but their beauty and mystery, their interest and meaning for us"

এই সত্যটির প্রতি ইঙ্গিত তাঁহার সব উপন্যাসেই আছে। এইজন্য শরৎচন্দ্র মানবহৃদয়কে কখনও কোনো প্রকার সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই। সমাজের কৃত্রিম বন্ধনের মধ্যে মানুষের চিত্ত যে পীড়া অনুভব করে তাঁহার সাহিত্যে তাহা অনায়াসেই প্রকাশ পাইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'দেবদাস' ও 'পল্লীসমাজ' দেখা যাইতে পারে। সমাজ-শক্তির অলক্ষিত পীডনে রমা এবং রমেশের প্রেম ব্যর্থ হইল, আর দেবদাসের জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী হইয়া শেষে যেরূপে তাহার জীবনের অবসান হইল তাহা আমাদের মনে সহানুভূতির উদ্রেক করে। শরৎচন্দ্র তাঁহার নিজের অন্তরের উপলব্ধ সত্যের আলোকে সমাজের ও মানবমনের রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি আর্টে পরিণত হইয়াছে। গভীর সহানুভূতি ও অনুকম্পার মাধুরী দিয়া মানব জীবনের কঠোর নগ্ন সত্যকে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় প্রাকৃত সত্য সাহিত্যের সত্য হইয়াছে।

সমাজের নিয়ম ও সাহিত্য সৃষ্টির নিয়মকে, শরৎচন্দ্র এক বলিয়া মানিয়া লন নাই। কারণ সমাজ অনেক সময়ে আমাদেব বাহিরেব জিনিস দেখিয়া বিচার করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু সাহিত্যে সে রকম কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। সমাজ এমন অনেক দণ্ড বিধান কবিযা থাকে যাহাতে আমাদের মন সায় দেয না। শবৎচন্দ্রের সাহিত্য মানুষের অন্তর লইয়া বিচার করিয়াছে সমাজকে কখনও তাঁহার সৃষ্ট আর্টেব উপব আধিপত্য কবিতে দেয় নাই!

সামাজিক আঘাতে আঘাতে নির্জীব বাংলার নবনাবীর অন্তরকে শরৎচন্দ্র সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং সেই-সব অন্তরের উপযুক্ত মর্যাদা দান করিযাছেন। উপন্যাসসমূহের মধ্যে তিনি যখন বাঙ্গালীকে আঘাত করিয়াছেন তখন বাঙ্গালীর মন কাড়িযাছেন। যুগ যুগ ধরিয়া যে অন্যায় অত্যাচারে বাংলার সামাজিক জীবন অন্ধকার ও অসাড় হইয়া গিযাছিল শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিতে গিয়া জনসমাজেব অন্তবের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া সেই অত্যাচারের ব্যথা তাহাদের মনে নূতন কবিয়া জাগাইয়া দিয়াছেন এবং আশ্চর্য এই যে সেই আঘাত সত্বেও সকলের অসাড় মন সাড়া দিয়াছে। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে অনেকখানি rationalism ঢুকাইয়া দেওয়ার প্রধান সহায়ক তিনি। এই দিক হইতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক। বাংলাব সমাজের আচার-ব্যবহাব ব্যবস্থা রীতি-নীতি একটা অন্ধ-বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হইয়া যেরূপ একভাবে চলিয়া আসিয়াছে, এবং পুবাতন কতকগুলি কুসংস্কাবে আবদ্ধ থাকাতে যে জড়তার প্রভাব দেশবাসীব উপর ধীরে ধীরে বিস্তাব লাভ করিয়াছে, তাহা তিনি নির্ভীকচিত্তে দেখাইয়াছেন এবং ঐ-সকল বিষয় লইয়া তাঁহার উপন্যাসে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের বিশিষ্টতা ও জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁহাব অপূর্ব চরিত্র-

সৃষ্টিতে। এই চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধানের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টির দুই শ্রেণীব হইতে পারে। কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিতে যাইয়া গ্রন্থকাব মানুষের হৃদযেব ভাব চিন্তা এবং বিবিধ বৃত্তিসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্রের অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য বুঝাইযা দেন এবং কখনও বা স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। আবার কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থকার ছাড়িয়া দেন, উহারা কথোপকথন ও কার্যকলাপ দ্বাবা নিজেবাই বর্ধিত ও পুষ্ট হয়। তখন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা এবং অবস্থার সংঘাত দ্বাবা ঔপন্যাসিক তাঁহার সৃষ্টিতে একটি দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষেব চিত্র অঙ্কিত করেন। এই দ্বন্দ্ব থাকে সত্য ও অসত্যেব, পাপ পুণ্যের, বা সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে। উপন্যাসের লেখক নিজে অন্তরালে থাকিযা বর্ণনা-চাতুর্যে সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক কবেন, পাপেব প্রতি ও অন্যায়েব প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেন, অথবা সত্যকে গ্রহণ কবিবার একটি অদম্য স্পৃহা পাঠকেব মনেব অন্তরালে জাগাইযা তোলেন। শবৎচন্দ্রের সৃষ্ট চবিত্রসমূহ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চবিত্রের অনুরূপ। তিনি চবিত্রগুলিকে পবিচালিত করেন নাই। কেবল চবিত্রসমূহের ভাব চিন্তা ও অভিপ্রাযকে পূর্ণবিকশিত কবিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে ধবিয়াছেন। চরিত্রবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চবিত্রসমূহের অন্তর্জগতেব দ্বন্দ্ব বিপ্লবও পবিষ্কার ভাবে ফুটিয়াছে। হৃদয়কে এইভাবে ব্যক্ত করিতে তাঁহাকে বিশেষ বক্তৃতা কবিতে হয নাই, কারণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথোপকথন এবং কার্যকলাপ দ্বাবা চবিত্রগুলি আপনা-আপনিই ফুটিযা উঠিয়াছে। সেই জন্য ঐ-সব চবিত্রের সুখ দুঃখ বা অন্তর্নিহিত বেদনা-চাঞ্চল্য আমবা আমাদের হৃদয়েব মধ্যে অনুভব কবি। তাঁহার চরিত্র-চিত্রণেব বৈচিত্র্য বাংলা-সাহিত্যে নূতনত্ব আনিযাছে। মানব-চবিত্র বুঝিবাব এবং সৃষ্টি করিবার অসাধাবণ কৃতিত্ব হেতু তাঁহাব সকল

চিত্তে এই দুইটি শক্তির মধ্যে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে শরৎচন্দ্র তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। পুরুষ বহুদিন হইতে স্বাধীন এবং বুদ্ধিজীবী। তাহার কাছে সংস্কার আসে প্রধানত বুদ্ধির পথে এবং বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া সাধারণত হৃদযের গভীরতম প্রদেশে আঘাত করিতে পারে না। কিন্তু নারীব কাছে সমাজশক্তির প্রভাব তাহার আন্তরিক প্রবৃত্তির বিরোধী নহে। ইহা তাহাব অন্তরেরই জিনিস। এই সংস্কারকে অবহেলা করিতে না পাবিযা তাঁহাব স্বষ্ট নাবীচরিত্রসমূহেব মনের মধ্যে অসংখ্য দুঃখ দ্বন্দ্ব ও বিফলতা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

সাবিত্রী অথবা রাজলক্ষ্মীর জীবন পর্যালোচনা কবিলে এই জিনিসটিই বিশেষ কবিয়া চোখে পড়ে। সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিত, নিজেকে সতীশের ভাল-মন্দের জন্য দায়ী মনে করিত। সর্ববিষযে সতীশ ছিল সাবিত্রীর চির-আকাঙ্ক্ষার পাত্র। কিন্তু সাবিত্রীর অজ্ঞাতসারে তাহাব মনে যে সংস্কার চাপিযা বসিয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। হিন্দু বিধবাব ব্রহ্মচর্যেব সংস্কার ও বমণীর একনিষ্ঠতার শিক্ষা বাব বার তাহাকে বলিয়াছে যে সে অন্যায় কবিতেছে। সেইজন্য সাবিত্রী সতীশের কাছে যাইয়াও সরিযা গিযাছে, আঘাত পাইযাও অগ্রসর হইযাছে, অগ্রসব হইয়াও পিছাইয়া গিয়াছে। তারপব রাজলক্ষ্মীর মনের মধ্যেও এই সংস্কার নীড় বাঁধিযাছিল। রাজলক্ষ্মী হিন্দুঘরের বিধবা, কিন্তু তাহারও যদি সত্যকারের কোনও বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাহা শ্রীকান্তের সঙ্গেই। তাহার মনের ভিতরে প্রথম যে শক্তি মাথা তুলিল তাহা রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বের গৌরব। ইহার পর আমরা তাহার ও শ্রীকান্তের সমাজভীতির আভাসও পাইয়াছি। ‘দ্বিতীয় পর্বে’র শেষে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে তাহার স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু পরিপূর্ণ মিলনের সূচনা ত হইল না। রাজলক্ষ্মীব মনের মধ্যে যে ধর্মসংস্কার সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল

তাহাকে সে নিরস্ত করিতে পারিল না। ফলে তাহারও প্রেমের সকল মাধুর্য ও গৌরব সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারিল না। সংস্কারের চাপে তাহার জীবনের সকল ঐশ্বর্যের অপচয় হইল। বাহির হইতে সমাজ তাহাদের আক্রমণ করে নাই—ইহা তাহাদের মনের মধ্যে বসিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে, সংস্কারকে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিল।

নারীর অন্তরের উপর সমাজশক্তি ও সংস্কারের এইরূপ পীড়ন দেখাইয়া তিনি কেবলমাত্র একটি ভাবের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু তাহা ব্যক্ত করেন নাই। তিনি যেন নারীদের ডাক দিয়া বলিয়াছেন, তোমাদের এই পথ, সমাজ তোমাদের উপর এমনি ব্যবহার করিবে, তোমরা স্বপ্রতিষ্ঠিত হও। 'নারীর মূল্য' তিনি বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার সাহিত্য আমাদের দেশে নারীত্বের আদর্শ গড়িয়া তুলিতে চায়। বাংলা-সাহিত্য আজ নারীকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার দিতে বসিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের এ বৈচিত্র্য অতি মূল্যবান জিনিস।

আধুনিক সাহিত্যের কল্যাণে আজ আমাদের অনেক ব্যাপার সম্ভবপর হইয়াছে। নারী আজ সংস্কারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ নহে, এখন আমাদের মনের মধ্যে এই কথা জাগ্রত হইয়াছে যে নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে ইহার নির্ভীক উত্তর পাইয়া আমাদের মন বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠে। এই সত্যকে এতখানি সাহসের সহিত বাংলার সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

তাঁহার অঙ্কিত প্রণয়চিত্রগুলি জীবন-রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্য সংযমের সহিত তিনি এই-সব চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ রমা এবং রমেশের ভালবাসার চিত্রটি দেখা যাক্।

রমা এবং রমেশের ছেলেবেলাকার ভালবাসা যৌবনে কতদূর যে

অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দুইজনের কাহারও অবিদিত ছিল না। তাহাদের ভালবাসায় কৃত্রিমতাও ছিল না, উদ্দামতাও ছিল না। কিরূপ অল্প কথায় অল্প আয়োজনে তাহাদের ভালবাসার গভীরতা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন! রমেশের ভালবাসা বিশ্বাস-বাক্যে ও ব্যবহারে খানিকটা প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু রমার সে প্রেম সামাজিক ব্যবহারিক বৈষয়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে প্রকাশিত হইতে পায় নাই। তাহার অন্তরের এই নিরুদ্ধ প্রেম "যতীনের" সহিত "ছোটদাদার" সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-পূর্ণ এবং সকুণ্ঠ আলাপের মধ্য দিযাই বেশ বোঝা যায। তারপর তারকেশ্বরের পুকুরের ধারে স্নান-সমাপনের পর রমার সহিত রমেশের দেখা-হওয়া যে পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে সেখানে শত দ্বন্দ্বেও আর তাহাদিগকে ভুল বোঝা অসম্ভব। সর্বশেষে অসুস্থতার মধ্যে বিশ্বেশ্বরীর সহিত রমার মর্মান্তিক কথোপকথনে রমার মনের আসল রূপটি ধরা পড়িয়াছে। এই অল্প কথা, এই সংযত আচরণ, অথচ ইহার ভিতর দিয়া ভালবাসার কি অসীম আকুলতাই না প্রকাশ পাইয়াছে! সবচেযে প্রকাশ পাইয়াছে রমা যখন হৃদয়ের দুর্দম প্রণয়কে আঘাত করিবার জন্য বারম্বার রমেশের প্রতিকূলতা করিয়াছে এবং রমেশকে ব্যথা দিয়া নিজে অধিকতর ব্যথিতা হইয়াছে।

সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মতবাদ চোখে পড়ে না। তবে চরিত্রসমূহকে মধ্যস্থ রাখিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিয়াছেন। মধ্যবিত্ত সংসারের বধূ হওয়া সত্ত্বেও কিরণময়ীর যুক্তির প্রখরতা ও কথাবার্তা আমাদের আশ্চর্য করে সত্য, কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে এই চরিত্রটিকে মধ্যস্থ রাখিয়া লেখক তাহার বক্তব্য বলিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠকবর্গের চিন্তার মূলে নূতন কিছু খোরাক যোগাইয়াছেন। "শেষপ্রশ্নে"র কমলকে মধ্যস্থ রাখিয়া তিনি নূতন অনেক কিছু বলিয়াছেন। কমলের প্রাণের যে

পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে এই বুঝিয়াছি যে সে সর্বসংস্কারমুক্ত একটি আদর্শ নারী-চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" যেমন কোন বিশেষ দেশের নয়—তাহার চরিত্র যেমন পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রণে গঠিত—কমলও তেমনি। এইখানে শরৎচন্দ্র idealist বা আদর্শবাদী সাহিত্যিক। বাংলা দেশের নারীর কি হওয়া উচিত তাহার আভাস তিনি এই চরিত্রের ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। এই চরিত্রে নারীর মহিমা বা মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে তর্ক করিয়াছে এবং প্রাচীন ভিত্তিহীন কুসংস্কারকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য জোর গলায় নিজেকে বিপ্লবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

নবনারীর দুঃখে ও বেদনায় শরৎচন্দ্র ব্যথিত হইয়াছেন কিন্তু তাহার মীমাংসা করেন নাই। মীমাংসা না পাইয়া আমাদের ভালই হইয়াছে। কারণ উপলব্ধ বেদনা আমাদের হৃদয়ে গভীর হইয়া থাকিবার অবকাশ পাইয়াছে। মীমাংসা না করিয়া তিনি পাঠকদিগকে ভাবাইয়াছেন ও কাঁদাইয়াছেন। রমেশ যে সমাজ কর্তৃক উৎপীড়িত হইল, রমা এবং রমেশ হৃদয়ের মধ্যে যে প্রেম বহন করিয়া সামাজিক বিধিনিষেধের বশে সার্থকতা পাইল না—শরৎচন্দ্র কেবল এই দুঃখের দিকটা দেখাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সামাজিক অনুশাসনের কোনও বিচার তিনি করেন নাই। মীমাংসা না করিয়া রমা ও রমেশকে মিলিত করিলেন না বলিয়াই তাহাদের দুঃখ বেদনা আমাদের সহানুভূতি পাইয়াছে, এবং আমাদের হৃদয়ের নিকটতর হইতে পাইয়াছে। সাবিত্রী ও অন্নদাদিদির কপালে সমাজ অসতীর কালো ছাপ মারিয়া দিয়াছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখনী কোথাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই। শরৎচন্দ্র হৃদয়ের আবেগ ও সহানুভূতি দিয়া ঐ-সব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের সতীত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও সংশয় নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহের

দুঃখ বিফলতা ও তাহাদের উপর সমাজের অলক্ষিত অথচ ভীষণ উৎপীড়ন tragedy হইয়া আমাদের অন্তরে চিরকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে।

সাহিত্যে অনেক সময়ে ট্র্যাজেডি আসে মরণের মধ্য দিয়া। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুর স্থান নাই। সমাজের ও সংস্কারের প্রভাবে যে মীমাংসা-হীন দ্বন্দ্বের মধ্যে নারী-জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমস্ত মহিমা নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাই সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। শরৎচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রের এই দ্বন্দ্বের মধ্যে অবচেতন প্রবৃত্তির সহিত সচেতন সংস্কারের সংঘাতকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত রমা, বড়দিদি পার্বতী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের জীবনের সকল মাধুর্য ও মহিমার অপচয় হইয়াছে। এই অপচয় ও বিফলতাই ট্র্যাজিডির প্রাণ। তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্র সমূহের মধ্যে যে ভালবাসা জাগিয়াছে তাহার আকর্ষণ অয়স্কান্তের আকর্ষণের মত প্রবল। আবার তাহাকে প্রত্যাখান করিবার শক্তিও পর্বত নিঃসৃত নির্ঝরের মতো দুর্বার। এই দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসা নাই। ইহাই তো ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান উপকরণ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ মানবজীবন হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। এইজন্য তাঁহার উপন্যাসের ঘটনাবলী সকলের অন্তর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। তিনি তাঁহার উপন্যাসে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতাকে, কল্পনাকে ও আদর্শকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'art for art's sake', কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা পাই 'art for life's sake' অর্থাৎ শরৎচন্দ্র কেবল গল্পের জন্য লেখেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য মানুষকে তৈয়ারী করা।

আমাদের দেশের বহুকালের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের অচলায়তনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তিনি জীবনকে বৃহত্তর গভীরতর ও দৃঢ়তর করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান। তাঁহার উদ্দেশ্য—সমাজশক্তির নিপীড়নে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। মানবজীবন ও মানবসমাজের কল্যাণের জন্য তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য

মহাকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যের বহুকালের প্রথা নহে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি মহাকাব্য নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনা আরম্ভ হয়। বাংলা সাহিত্যে কবিপ্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে গীতিকাব্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-সব যুগপ্রবর্তক কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মহাকাব্য রচয়িতা। এই মহাকাব্য রচনার অর্থ কি, ইঁহারা প্রথমে কি কারণে মহাকাব্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই আবার কেন এই ধরণের কাব্য-রচনা বন্ধ হইয়া গীতিকবিতার ধারা বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিল—উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্য আলোচনা করিলেই এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যের খুব প্রবল প্রভাব ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ ছিল ক্লাসিক আদর্শ। শেলী কীট্‌স্ প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদিগের সহিত বাঙ্গালী তখনও সম্যকভাবে পরিচয় লাভ করে নাই।

সেইজন্য উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিগণ মহাকাব্য রচনাকেই শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভার উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ইংরেজি মহাকাব্যের সমাদর বাঙ্গালী কবিদিগকে মহাকাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল। সেকালের সাহিত্যিকগণের ধারণাই ছিল যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে মহাকাব্য এবং একমাত্র মহাকাব্য রচনাতেই কবিপ্রতিভা সম্যক প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার উপর, আখ্যানমূলক রচনার জন্য বাংলা গদ্য তখনও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। অথচ সাহিত্যিকমাত্রেরই প্রাণ মন তখন নূতন নূতন আদর্শে ভাবে ও বড় বড় কাহিনীতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে সেকালের সাহিত্যিকগণ দেখিলেন যে একমাত্র মহাকাব্যের সাহায্যে যে-কোনও একটি বড় কাহিনী প্রকাশ করা সম্ভব। এই সব কারণে সে যুগের কবিগণ মহাকাব্য রচনার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক মহাকাব্য কি, এবং কি ধরণের মহাকাব্য আমাদের বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছিল। প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করেন—খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে এই—(1) কোনও পুরাণের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আখ্যান, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান দেবতা, কোনও সৎকুলজাত যশস্বী নৃপতি অথবা চন্দ্রবংশ সূর্যবংশের ন্যায় কোনও প্রখ্যাত রাজবংশের চরিতাখ্যান অবলম্বন করিয়া ছন্দে রচিত কাব্য মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে প্রকৃতির বর্ণনা ও ঋতুবর্ণনা থাকিবে, সৈন্যচালনা ও যুদ্ধ, রাজা বা সেনাপতিবর্গের মন্ত্রণা, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, বিরহ মিলন, উৎসব পার্বণ প্রভৃতির সমুদয় অথবা কোনও কোনও বিষয় মূল আখ্যানের সহিত গ্রথিত হয়। (2) মহাকাব্যের সর্গগুলি খুব বড়ও হইবে না অথচ খুব ছোটও হইবে না এবং সংখ্যায় আটটির অধিক হইবে। (3) কবি তাঁহার নিজের ইষ্টদেব-

তার স্তুতি-বন্দনা করিয়া অথবা সাধারণের মঙ্গলকামনা করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করেন। প্রত্যেক সর্গের শেষে বর্ণিত বিষযের আভাস প্রদত্ত হয় এবং সর্গগুলি একরূপ বা বিবিধ ছন্দে রচিত হয়। সাধারণত যে-কোনও একটি বিশেষ ছন্দে মহাকাব্যের সর্গ রচিত হয়, তবে সর্গশেষে কবি বিভিন্ন ছন্দের অবতারণা করিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোনও সর্গের বর্ণিত বিষযের অনুসারে, অথবা সেই সর্গের ছন্দ বা নায়কের নামানুসারে সর্গের নামকরণ হয়। মহাকাব্যে বীর, করুণ, আদ্য ও শান্ত এই চারিটি রসের যে কোনও একটির অথবা উক্ত সব কয়টি রসেরই প্রাধান্য থাকে এবং মহাকাব্যের মধ্যে নাটকীয় ভাব বর্তমান থাকিবে।

প্রাচ্যের আলঙ্কারিকগণের মত পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণও মনে করেন আখ্যায়িকা বা উপাখ্যানের বর্ণনাই মহাকাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ যাহাকে এপিক বলিয়াছেন তাহার সহিত প্রাচ্য মহাকাব্যের আদর্শগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এপিকের বিষযটি বেশ গুরুগম্ভীর ও অসাধারণ হওযা চাই। একটি মহান্ ও চির-বিস্ময়কর, হৃদয়োন্মাদক ও অভূতপূর্ব উপাখ্যানের বর্ণনা এপিকের প্রধান উদ্দেশ্য। এপিকের নায়কের বীরোচিত কার্যকলাপে সকলে উৎসাহিত হইবে এবং নায়ক শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইয়া মহাশক্তি-মানের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য আদর্শে এপিক পদবাচ্য হইতে হইলে তাহার মধ্যে কথাবস্তুর অভিন্নতা (unity of action) ও বিষয়-গৌরব থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহা যেন হৃদয়গ্রাহী হয়। এপিকের লেখক যে গল্পাংশের জন্য প্রতিপদে ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহা নহে। এ সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীন। তবে পৌরাণিক আখ্যান, জনশ্রুতি

বঙ্গ-সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শের ফলে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বৈচিত্র্যময় বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এবং বিশেষত মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তাই যে বিশ্ব-সাহিত্যের ভাব জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে স্থিতি ও দৃঢ়তা প্রদান করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টির নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকল প্রতিভাবান সাহিত্যিক পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। চেষ্টা করিলেও ঐ সব সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য অথবা রচনা-রীতির বিচিত্রতা ছিল না। বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল না বলিয়া একই বিষয়ের উপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কবি রঙ্ ফলাইয়াছেন। কেবল কতকগুলি ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে কবিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন —"Poetry is ultimately an expression of a religious idea"

—কবিতা মানবজীবনের ধর্মভাবের স্ফুটপ্রকাশ মাত্র—এই সংজ্ঞা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইবার পরে বঙ্গসাহিত্যে বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্য তো আসিয়াছেই, ভাবগত ও কল্পনাগত বিচিত্রতাও আসিয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বাঙ্গালীর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং উহা বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রভাব সূচিত হওয়ার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া রচনা হইত। সেই যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান বিষয় ছিল 'গীতিকাব্য', 'অনুবাদ সাহিত্য', দেবদেবীগণের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 'মঙ্গলকাব্য' ও 'চরিতাখ্যান'। এই কয়টি বিষয়ের মধ্যে বাঙ্গালী কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। ভাব-গভীরতা ও ভাষা-সৌষ্ঠবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ও এক-মাত্র গৌরবস্থল গীতিকাব্য। মঙ্গলকাব্য সমূহে দেব-দেবীর চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সেইজন্য সেখানে মানব চরিত্রের স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ হয় নাই। আধুনিক কালের মত জীবনচরিতও তখন রচিত হইত না। শ্রীচৈতন্যদেব অথবা তাঁহার পার্শ্বদগণের যে-সব জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহার প্রায় সবগুলিতেই বর্ণিত চরিত্রের উপর আলৌকিকত্ব ও দেবত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহাই মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যের জীবন-চরিতের বিশেষত্ব। এইজন্য 'মঙ্গলকাব্য' জীবনচরিত প্রভৃতিতে human interest নাই বলিলেও চলে। মঙ্গলকাব্য সমূহে দেবতাগণকে বিজয়ী করিবার চেষ্টা এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ সে যুগের সাহিত্যে অসম্ভব ছিল।

ইহার উপর, সেই যুগের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতের খুব প্রবল প্রভাব

দেখা যায়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বঙ্গভাষার একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে জয়দেবের প্রভাব ও ভাগবতের আখ্যানের ছায়া দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাসের বর্ণনা-কৌশলও সংস্কৃত কবিদের মত। 'শূন্যপুরাণ'ও বাংলা সাহিত্যের একখানি প্রাচীন পুস্তক। ইহাতে সংস্কৃত প্রভাব সুস্পষ্ট। জীবনচরিত সমূহেও সংস্কৃত প্রভাব অনুভূত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস ভাগবতের আখ্যান অনুযায়ী চৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভাব আহরণ করিয়া সেই আদর্শে চৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কয়েকটি অধ্যায় সেই শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই পূর্ণ। তাঁহার রচনা-ভঙ্গীও সংস্কৃত লেখকদের মত। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে রচিত।

কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের সূত্রপাত হইল। তখন হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের নব-আশাপূর্ণ জীবন আরম্ভ হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর শ্রীরামপুর মিশন স্থাপিত হয় ধর্মপ্রচারের জন্য। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইলেও সাহিত্যসৃষ্টির সহায়তার দিক দিয়া উভয়ের প্রচেষ্টা ও দান অনুরূপই হইয়াছিল।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের ইংরেজদের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালী লেখকগণ গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। বাংলা কাব্যের ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও সমৃদ্ধ হইলেও বাংলা গদ্যের ইতিহাস তত প্রাচীন নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষ হইতে মাইকেল মধুসূদনের অভ্যুদয় পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার গদ্য পরিপুষ্টির ইতিহাস।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে যে গদ্যের উদাহরণ পাওয়া যায় তাহাব রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহী নহে। চণ্ডীদাস লিখিত "চৈতন্যরূপ-প্রাপ্তি", 'শূন্যপুবাণে'র ভিতরের গদ্য-ভাগ কতিপয় চিঠি এবং দলিল পত্র ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ ইহাই প্রাক্-ব্রিটিশযুগেব গদ্য। এই গদ্য যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ সেইরূপ পূর্বাপর সম্বন্ধ বিবহিত। কিন্তু শ্রীবামপুর মিশনের কেরী, মার্শম্যান, হল্‌হেড প্রমুখ পাদ্রীগণ বাইবেলের অনুবাদ করিলেন, অভিধান লিখিলেন, ব্যাকবণ ও সংবাদপত্র ছাপাইলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ শিক্ষকবৃন্দও গদ্য রচনাব দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়া বঙ্গসাহিত্যেব কৃতজ্ঞতাভাজন হইযা বহিয়াছেন ইঁহারা নিজেরা বাংলায় গদ্য রচনা কবেন। কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান ব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে বচনার বিষয়-সন্নিবেশ কবিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থ মুদ্রিত কবিতে হয় তাহা ইংরেজেব শিক্ষার দ্বাবাই বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হইযাছে।

১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে বাংলায মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ প্রচাবেব সময গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত বাংলা বচনা অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং সংস্কৃত ও পার্শী প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। বিদ্যাসাগর অক্ষয়-কুমার বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির অভ্যুদযের পূর্বেকাব যুগেব গদ্যের ভাবপ্রবাহ যেন একটু আড়ষ্ট ও মন্থর। সেইযুগে গদ্য রচনার কোনও বিশিষ্ট পদ্ধতি তখনও গডিযা উঠে নাই। অনুবাদ ও অনু-করণের মধ্যে সেই যুগের গদ্য-রচনা আবদ্ধ ছিল। তথাপি এই অনু-বাদের বিচিত্র ও বহুমুখী গতি সাহিত্যকে সজীবতা ও ভাবপ্রবাহ দান করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিযাছে।

ইংরেজের আগমনে ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে রচনার বিভিন্ন দিক খুলিয়া

গিয়াছে। সংবাদপত্র পরিচালনা, নাট্য-সাহিত্য, উপন্যাস-সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য আসিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বাঙ্গালী সংবাদপত্রের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সুযোগে সকল শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দেশময় উৎসাহ জাগিয়া উঠিল—বিশেষত সংবাদপত্র প্রকাশে। এই সব সংবাদপত্রের সাহায্যে বাংলা গদ্যের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাংলা গদ্য ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি সকল প্রকার রচনার উপযোগী সবলতা লাভ করিতে লাগিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বাংলা গদ্য সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিল। এক কথায় বলিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে বাংলা গদ্য জীবন্ত-সাহিত্যের বাহন হইয়াছে—তখন হইতে বাংলা গদ্যে স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দেখা দিয়াছে—বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, সমালোচনা, প্রবন্ধ-সাহিত্য, রাজনৈতিক সাহিত্য এবং সাহিত্য-সেবার উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকার প্রচলন এ সমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্র ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথেরও বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ইংরেজ-প্রভাবে আমাদের দেশীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক রচনা আরম্ভ হইয়াছে। নাট্য-সাহিত্য জাতির পরিণত অবস্থার ছবি। যে কোনও জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জাতি যখন উন্নতির, গৌরবের ও মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত তখনই নাট্য-সাহিত্য সম্যক স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। জাতির শৈশবে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে গীতিকবিতা, জাতির যৌবনে নাটক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত আদর্শে নাটক রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক রচনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রথম নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক। ইহার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য আদর্শে বিশেষ সাফল্যের সহিত 'শর্মিষ্ঠা' 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' ইংরেজি ভাব ও রীতি অনুসারে রচিত। তাঁহার 'পদ্মাবতী'তে তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে নাট্যবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত বঙ্গসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য আদর্শের রোমান্টিক নাটকের সূত্রপাতও মাইকেল হইতে। মাইকেল ছিলেন প্রধানত কবি এবং তাঁহার মন ছিল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, সেইজন্য তাঁহার নাটকগুলিও তাঁহার কবি-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই Idealism বা ভাবপ্রবণতা এবং রোমান্স বা কল্পনার বৈচিত্র্যটুকু তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব।

এই যুগের নাট্য-সাহিত্য মাইকেল এবং দীনবন্ধুর হাতে রূপান্তরিত হইয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষে এক নূতন রূপে ও ভঙ্গীতে বিকশিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসিয়াছে। মাইকেল আধুনিক যুগের কাব্য-সাহিত্যের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ মাইকেল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আধুনিক বাংলা কাব্য সুরু হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনি প্রথমে ভাঙ্গনের এবং সেই ভাঙ্গনের ভূমিকার উপরে গঠনের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে

ক্রমে নয় ধীরে ধীরে নয়। পূর্বেকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্তেই একটা নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়লো জলের ভিতর থেকে। আমরা কি দেখলুম ? কোন একটা নূতন বিষয় ? তা নয় একটা নূতন রূপ।" বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রতিষ্ঠা মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রধান কীর্তি। বঙ্গভাষার অভ্যন্তরে যে গূঢ় শক্তি নিহিত ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়েরা তাহা গদ্যে আবিষ্কার করেন, আর পদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন মধুসূদন। কেবল পদ্যে কেন, নাটক প্রভৃতি গদ্য রচনাতেও তিনি বঙ্গভাষার শক্তি আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন। মাইকেল তাঁহার রচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের সম্মিলন করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মাইকেলই ইহা সর্ব-প্রথমে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাবের সুসামঞ্জস্যময় সম্মিলনেই ভবিষ্যৎ যুগের বাংলা সাহিত্য গঠিত হইবে এবং তবেই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আসন পাইবার যোগ্য হইবে। মধুসূদনের প্রতিভা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিয়াছে।

মাইকেলের কাব্যে ইংরেজ কবি সেক্স্পিয়ার, মিল্টন, গ্রীক কবি হোমার ও ইটালীর ভার্জিল দান্তে ও তাসো প্রভৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মাইকেলের কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারার উপর উক্ত কবিগণের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ছন্দ সৃষ্টিতেও মাইকেল পাশ্চাত্য কবি হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মাইকেল তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দসৃষ্টিতে ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রছন্দা কবি মিল্টনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। মাইকেল একবার বলিয়াছিলেন "ইটালীর মিশ্র ছন্দকে বাংলায় আনা যায় না কি ?" তাঁহার মত প্রতিভাবান্ কবির পক্ষে অসম্ভব কিছুই ছিল না। তিনি ইটালীর মিশ্রছন্দের সৌকর্যে ও মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার প্রসারধর্মী

পয়ার ও নৃত্যধর্মী লাচাড়ী এই দুই ছন্দের সমন্বয় করিয়া এক নূতন বাংলা মিশ্র-ছন্দের উদ্ভাবন করেন। তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' এই ছন্দের বহুল প্রয়োগ আছে। মাইকেলের সনেটের ছন্দও পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল।

পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় রূপ ও আদর্শের অনুপ্রেরণায় মাইকেল সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ওড্ রীতি ও সনেট প্রবর্তন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে বিচিত্রতার আস্বাদন দিয়াছেন। তাঁহার মধ্য দিয়াই ইউরোপীয় সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে সর্ব-প্রথম সচেতন ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। সাহিত্যশিল্পের যে-সব রীতি বা পদ্ধতি বাঙ্গালী পূর্বে জানিত না অথবা বঙ্গসাহিত্যে যাহা প্রচলিত ছিল না, মধুসূদন তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্তিত করিয়া বাঙ্গালীর চোখ খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহার পর হইতে বঙ্গসাহিত্য সেই আবিষ্কার-পথে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া চলিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দার মধ্যভাগে বাংলা কাব্যে সেক্স্পিয়ার, মিল্টন, পোপ গোল্ডস্মিথ, স্কট, মুর প্রভৃতি কবিগণের প্রবল প্রভাব ছিল। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের বীজ ছিল। ইহা ভিন্ন, সেই যুগের কবিগণের মনের মধ্যে ভাবরাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। এই পুঞ্জীভূত ভাবরাশি প্রকাশ করিবার জন্য গদ্যের প্রবাহ ও প্রকাশ-শক্তি তখনও সবল হইয়া উঠে নাই। সেইজন্য সেই যুগের কবিগণ মহাকাব্য রচনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়টি বাংলা মহাকাব্য রচিত হয় সেগুলি পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে রচিত। কারণ তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই ইংরেজি সাহিত্যের কাব্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরেজি মহাকাব্যের ভিতরে যে-ধরণের কবি-দৃষ্টি ও কলা-নৈপুণ্য আছে তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্তিত করিবার প্রচেষ্টা সকল কবির ভিতরে বর্তমান দেখিতে পাওয়া

যায়। কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পুনর্বার গীতিকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাহার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমত, মহাকাব্যের আখ্যায়িকা ও গল্পের তৃষ্ণা বঙ্কিমের নবজাত উপন্যাসে তৃপ্ত হইল। দ্বিতীয়ত, যখন শেলী, কীট্‌স্, প্রভৃতি ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সহিত বাঙ্গালী কবিগণ পরিচিত হইলেন তখন বাঙ্গালী তাহার নিজের স্বাভাবিক গীতিকাব্যের জগতে ফিরিয়া আসিবার পথ দেখিতে পাইল। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী ও তাঁহারই সমসূত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকাব্যে এক নূতন সুর চড়াইয়া লোকের মন সেইদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যে নব-গীতিকাব্যেব যুগ আবম্ভ হইযাছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে বাঙ্গালী কবির কল্পনা ইউবোপীয় সাহিত্যের বোমান্টিক কাব্যের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। রোমান্টিসিজম্ বাংলা গীতিকাব্যে কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃত করিয়াছে—কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শে পরিবর্তন সাধিত করিয়া বাঙ্গালীর কবি-মানসকে আর্টিষ্টিক মনোহারিত্বের প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভা পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিগণের আদর্শে পরিপুষ্ট হইযাছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রোমান্টিসিজ্‌মের সকল লক্ষণ অনুভূত হয়, এবং তাঁহার উপর বোমান্টিক কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট। শেলীর স্বাধীনচিত্ত-বৃত্তি, অতীন্দ্রিয়তা ও ভাবোন্মত্ততা, কীট্‌সের ভোগ-সর্বস্ব সৌন্দর্যচেতনা, ব্রাউনিঙেব মিস্‌টিসিজ্‌ম, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অতি-সাধারণ বস্তু-গুণে গভীর আনন্দ উপলব্ধি, টেনিসনের শব্দশিল্পের সৌষ্ঠব এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুভূত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি পর্যায়ে রোমান্টিসিজ্‌মের আদর্শ ফুটিয়াছে। রোমান্টিক কবিদের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যকে বিচিত্রতার রূপ দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রূপক-গীতি-নাট্য সমূহও আধুনিক লেখক মেটারলিঙ্কের রূপক নাটকের আদর্শে রচিত বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কাব্যরীতি ও ভাবের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবাবেগ ও আধ্যাত্মিক ভক্তিপ্রেরণা তাঁহার সাহিত্যে যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, ইউরোপীয় গীতকাব্যের কল্পনা-বৈচিত্র্যও তেমনিই তাঁহার সাহিত্যকে অপূর্ব সৌষ্ঠব দান করিয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদেব সাহিত্যে দেশাত্মবোধ জাগিবা উঠিয়াছে,—বাংলা গীতিকাব্যে Subjective বা স্বানুভাবাত্মক বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। উপন্যাস-সাহিত্যে মানবচরিত্র-চিত্রণের দিকে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। নরনারীর হৃদয়-রহস্য বিশ্লেষণ কবিয়া উপন্যাস রচনা আরম্ভ হইয়াছে। মানব-জীবনের সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য রীতির প্রকৃতি-বর্ণনার দ্বারাও বাংলা কাব্যে একটি নূতন জগৎ খুলিবা গিয়াছে।

ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব আমাদের সাহিত্যে আসিবার পূর্বে বাঙ্গালী কবিগণ প্রকৃতির যে-সব বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। সেই যুগেব কবিদের কাছে প্রকৃতি ছিল জড়জগতেরই বৈচিত্র্য মাত্র। কারণ তখন কবিগণ প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেন নাই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উপর ইংরেজী রোমান্টিক কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হওয়ার পর হইতে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যসম্ভারকে কেন্দ্র করিয়া প্রকৃত কবিত্বের রসধাবা উৎসারিত হইয়াছে।

ইংরেজী কাব্য-সাহিতের রোমান্টিক যুগের কবিগণ—যেমন শেলী কীট্‌স্‌ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়াছিলেন। এই সব ইংরেজ কবিগণের প্রভাবে বাঙ্গালী কবিগণও মানব-মনের উপর প্রকৃতির নিগূঢ় ও রহস্যময় প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভব

করিয়াছেন। মানুষের আনন্দ-বেদনার সহিত প্রকৃতির যে একটি যোগ-সম্বন্ধ আছে তাহাও বাঙ্গালী কবিগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির ভাবের সহিত প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠ-সংযুক্ত রূপে দেখা—Interpenetrative affinity between Nature and the Poet রোমান্টিসিজ্‌মের একটি লক্ষণ। কবি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি', 'প্রবাসী' প্রভৃতি কবিতাতে রোমান্টিসিজ্‌মের এই লক্ষণটি খুব স্পষ্ট। প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের অভিন্ন-আত্মীয়তাবোধ এবং ভাবের আদান-প্রদান কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় খুব বেশী করিয়া ফুটিয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের গতি বিভিন্নমুখী হইয়াছে এবং বঙ্গসাহিত্য উন্নততর হইয়াছে। আধুনিক বাংলা কাব্যে, ছোট গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ইউরোপীয় সাহিত্যের যে মূল সুর তাহার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। বাংলা কাব্যের এই বৈচিত্র্যময় রূপ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের উপরেও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের প্রেরণা বর্তমান। উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটক রচনার আর্ট পাশ্চাত্য আদর্শের, এমন কি অনেক চরিত্রও পাশ্চাত্য আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে।

মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথকে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্য ক্রমশ রচনারীতি, বিষয়, ভাব প্রভৃতি সকল দিক দিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে—কাব্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা

বিশ্বপ্রকৃতি নিত্য নিরন্তর তাহার শোভা, সুষমা, বর্ণ, গন্ধ, গান ও আলো ছায়া লইয়া নরনারীর হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছে। যাহার কানে সেই ডাক পৌঁছায়, যাহার প্রাণে বিশ্বপ্রকৃতির সেই আহ্বান এক মধুর সুর বাজাইয়া দেয় এবং সহজেই যাঁহার কাব্যবীণায় বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দঝঙ্কার অনুরণন জাগায় তিনি কবি।

বাংলা সাহিত্যে খুব আধুনিককালে প্রকৃতির স্বানুভাবাত্মক বা Subjective বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে একেবারে অকুণ্ঠিতভাবে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের form, technique ও ভাবকে আত্মসাৎ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের উপর এইরূপে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব সূচিত হওয়ার পর হইতে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যসম্ভারকে কেন্দ্র করিয়া প্রকৃত কবিত্বের রসধারা উৎসারিত হইয়াছে। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের রোমান্টিক যুগের ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, শেলী, কীটস্ প্রভৃতি কবিগণ প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের উপর প্রকৃতির একটা নিগূঢ় প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তারপর, কবির ভাবের সহিত প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠসংযুক্ত-রূপে দেখা অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ (Inter-penetrative affinity between the nature and the poet)—যাহা শেলিঙের (Schelling) রোমান্টিক দার্শনিকতা হইতে উদ্ভূত—ইংরেজি রোমান্টিসিজমের একটি প্রধান লক্ষণ। বাস্তবিক, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত

এইরূপ একাত্মতাবোধই ইউরোপীয় রোমান্টিসিজমকে একটি অভিনব রূপ দান করিয়াছে এবং কাব্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছে। রোমান্টিক যুগের ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের এই বিশেষ আদর্শটি বাঙ্গালী কবির কল্পনাকে কাব্য-সৃষ্টির নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। ইহাতে বাংলা গীতিকাব্যে কল্পনার পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে। কেবলমাত্র ইংরেজি সাহিত্যই যে বাংলা সাহিত্যের কবিদের ভিতর নূতনভাবে প্রকৃতির অন্তর-রহস্য অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছে তাহা নহে। যুগধর্ম বা Time spiritও সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি ও নূতন অনুভূতির পথনির্দেশ করিয়া থাকে এবং কবিরা এই যুগধর্মের সহিত নিজেদের কাব্যবীণার সুর বাঁধিয়া লইয়া থাকেন। তবে মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে কল্পনার মূল সূত্র ধরাইয়া দিতে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়া করিয়াছে। কারণ আধুনিক যুগের কাব্যানুশীলন করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঠিক ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মত বাঙ্গালী কবিগণ প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়া প্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ করিয়াছেন।

ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের প্রভাব আমাদেব সাহিত্যে আসিবার পূর্বেকার কবিদের ভিতর প্রকৃতির যে-সব বর্ণনা আছে তাহাতে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কারণ ঐ সব কবিতাতে প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের অখণ্ড আনন্দের যোগ নাই এবং সে যুগের কবিগণ স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতিবর্ণনা না করিয়া প্রসঙ্গক্রমে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ, সেই সব কবিদের কাছে প্রকৃতি ছিল জড়জগতেরই বৈচিত্র্য মাত্র। বিখ্যাত সমালোচক Stopford Brooke অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,— "Nature has no sentiment of its own"-ইহা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সকল বাঙ্গালী কবি সম্বন্ধে খাটে। কারণ,

ঐ সব কবিগণ প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির একটি বিশেষ রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করিয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য হইতে একটি বর্ণনা দেখা যাক। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর ও জীবনীলেখক গোবিন্দদাস নীলগিরি পাহাড় দেখিয়া তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শির আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি' বাড়িল মনের কুতূহল॥

* * * *

কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥
ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে।
নানাবিধ পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ধগ্‌ধগি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে।

তার ধারে বসি' প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে॥

ইঁহার সমুদ্র এবং বনশোভার বর্ণনাও ঠিক এইরূপ। কেবলমাত্র এইরূপে প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ-বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে বহুদিন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলার' মধ্যে যেখানে সমুদ্র-বর্ণনা আছে সেখানেও এই রীতি দেখিতে পাই। তাহার পর, নবীনচন্দ্রের—

"নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়।
মিশাইয়া পরস্পরে,—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য। অনন্তের অনন্ত মিলন!"

এইরূপ বর্ণনায় চমৎকার সুরলালিত্য বর্তমান থাকিলেও কোনও নূতন ধরণের কল্পনা মাধুর্য প্রকাশ পায় নাই। এই বর্ণনায় সেই পুরাতন রীতিরই অবতারণা করা হইয়াছে।

এই ধরণের বর্ণনায় কবিগণ কেবল মাত্র প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। প্রকৃতির অন্তরে যে আনন্দের গতি আবেগ ও নৃত্যচ্ছন্দ নিত্য প্রবাহিত হইতেছে তাহা ঐ সব কবিগণের অনুভূতিতে আসে নাই। মানব-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব—যাহা প্রকৃতির অমর পূজারী রুশো ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—অথবা মানবের আনন্দ-বেদনার সহিত প্রকৃতির যে একটি যোগসম্বন্ধ আছে তাহা বাঙ্গালী কবিগণ বহুদিন পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কবি হেমচন্দ্রই বোধ হয় প্রকৃতির ছন্দের সহিত মানুষের হৃদয়ছন্দের যে একটি যোগ আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সর্বপ্রথম লেখেন—

"হায় রে, প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি ডোরে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?"

কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার বহু কাব্যে ও "ছিন্নপত্রের" বহু চিঠিতেই এইরূপ অনুভূতি অভিব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—"এই পৃথিবীর উপর আমার একটি আন্তরিক আত্মীয়বৎসলতার ভাব আছে।"—"ছিন্নপত্র।"

কবি বিহারীলালের পূর্ববর্তী সকল কবিকেই বিশ্বপ্রকৃতি কেবলমাত্র কল্পনার সূত্র ধরাইয়া দিযাছে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যথেষ্ট প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দু-চারটি চতুর্দশপদী কবিতাতে ছাড়া প্রকৃতির স্বতন্ত্র বর্ণনা নাই। হেমচন্দ্র প্রকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইলেও তাঁহার কাব্যে স্বতন্ত্র উচ্চাঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা নাই। নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনাতেও ইহাই লক্ষিত হয়। বাঙ্গালী কবিগণ প্রকৃতির হুবহু বর্ণনা করিতে গিয়াছেন বলিয়া কেহ নিসর্গ কবিতার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্র যোজন করাতে চমৎকার দেখিবার শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে উচ্চাঙ্গের কবিতা জন্মায় না। সেইজন্য প্রকৃতি বর্ণনার সহিত কবির রসানুভূতি, কবির অন্তরের অনুরাগ এবং প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের বিনিময়ের নিতান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

বিহারীলালের কবিতায় আমরা প্রথমে মানব-প্রকৃতির সহিত বিশ্ব-প্রকৃতির আদান প্রদানের পরিচয় পাই—

পবন তোমার চামর ঢুলায়,
কানন যোগায় কুসুমভার;
পাখীরা ললিত বাঁশরী বাজায়,
ধরায় আমোদ ধরে না আর।

মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির আনন্দের যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এখানে তাহারই পরিচয় পাইলাম। আবার—

তুমি সারদার বীণা খেলা কর কমলে
আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে। —শরৎকাল

এখানে ধরণীর গোপন আহ্বানের ইঙ্গিত কবির কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণস্পন্দনের বাণীটি বিহারীলালের নিকটে যেভাবে ধরা পড়িয়াছে তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও কবির দৃষ্টিতে পড়ে নাই। বিহারীলাল তাঁহার "সারদামঙ্গল" কাব্যের প্রথমেই Spirit of nature কে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিয়াছেন—

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে।
চরণ-কমলে লেখা
আধ আধ রবি রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্তি
সদয়া করুণামূর্তি,
বিতরেন হাসি' হাসি' শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর
ভাঙো ভাঙো ঘুমঘোর,
সুস্বপ্নরূপিণী উনি, উষারাণী সবে বলে।

কবি বিহারীলাল স্বানুভাবাত্মক বা subjective প্রকৃতি বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে সবপ্রথম প্রবর্তিত করিয়াছেন। subjective idealism-এর দ্বারা কবি তাঁহার নিজের অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করিয়া জগৎ দেখিয়া থাকেন। এই অনুভূতির উপর সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যকে স্থাপিত করিয়া কবি বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিহারীলালের প্রবর্তিত এই ধরণটি পরবর্তী যুগের কাব্যে চলিয়া আসিয়া বাংলা

কাব্যের অপূর্ব বিচিত্রতা সাধন করিয়াছে। বিহারীলালের শিষ্য কবি রবীন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন—

আমি মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা

অথবা— নব তৃণদলে ঘন বনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে।

তখন আমরা দেখিতে পাই যে কবি তাঁহার মনের আনন্দ প্রকৃতির উপর আরোপ করিয়া আত্মবিভোর হইয়া প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই যে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানস-দৃষ্টিতে রসমণ্ডিত করিয়া নূতন ও সুন্দরতর রূপে দেখা, ইহা প্রথম ফুটিয়াছে বিহারীলালের কাব্যে। এই-ভাবে যেখানেই কবিগণ বিশ্বপ্রকৃতিতে কবি-মনের মাধুরী মিশাইয়া উহাকে নূতন ও সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন সেখানেই আধুনিকতা।

অক্ষয়কুমারের উপর বিশ্বপ্রকৃতি বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দেখিতে পাই এবং তিনিও আধুনিক ভাবানুযায়ী প্রকৃতি-বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনেও আধুনিক কল্পনাভঙ্গী অনুসারে প্রকৃতিকে নানা ভাবে দেখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি অপূর্ব কাব্যশিল্পের উদাহরণ। বাস্তবিক দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইঁহার কাব্যে কীটসের কাব্যের মত একটা প্রবল Sensuousness বা ভোগসর্বস্ব সৌন্দর্যবোধ আছে। তবে কীটসের সৌন্দর্যপিপাসা অতি প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তুসকলের রূপ রং রেখা গতি ও স্থিতির ভঙ্গী, এ সকলই আশ্চর্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা কীটসের ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় কেবলই ভাবের স্বপ্ন অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাঁহার সৌন্দর্য-চেতনা ভাবাবেগ-

বিহ্বল, বস্তুজ্ঞান-বিমুখ। তবু বলিতে হয় যে দেবেন্দ্রনাথের ভোগসর্বস্ব সৌন্দর্যবোধের কবিতাগুলি বাংলা-সাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাব্যরসের উৎস উৎসারিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে তাঁহার অশোক-ফুল, অশোক-তরু—("অশোকগুচ্ছ") বর্ষার আনন্দ—("শেফালিগুচ্ছ") শিরীষ ফুল (পারিজাতগুচ্ছ) প্রভৃতি কবিতার নাম করা যাইতে পারে। কবির "অশোক তরু" কবিতাটি এই ধরণের কবিতাব উৎকৃষ্ট উদাহরণ—

হে অশোক, কোন্ রাঙা চরণ চুম্বনে
মর্মে মর্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল?
কোন্ দোল পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতি দুলাল?
কোন্ চির-সধবার ব্রত উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দূর বরণ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া হাসি করিলি চয়ন?

কীট্‌স্ এবং সুইন্‌বার্ণের কবিতায় যে Mythopoeic element পরিলক্ষিত হয়, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় অনেক কবিতাতেই সেইরূপ কল্পনা-বিলাস বর্তমান। তাঁহার কল্পনা চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রমদিরা পানে বিভোর, আর আকাশের রঙে ও চম্পকের শোকে মাতিয়া উঠে। তাঁহার "শেফালিগুচ্ছ" কাব্যে বর্ষশেষ ও নববর্ষ বিষয়ক যে-সব কবিতা আছে তাহার সবগুলিতেই ঐ ধরণের কল্পনাবিলাস লক্ষিত হয়। "শেফালি-গুচ্ছে"র বৈশাখ শীর্ষক কবিতাটিতে এই ধরণের কল্পনা খুবই সুন্দরভাবে অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে—

কপালে কঙ্কণ হানি' মুক্ত করি' চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল!

স্বামী তার চৈত্রমাস অনঙ্গের মত
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি' জানু করি নত,
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস ?

রুদ্রের মূরতি ও যে—একি সর্বনাশ !
ললাটে অনল হের ধক্ ধক্ জ্বলে।
সর্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম মাখি' কুতূহলে,
তপে মগ্ন,—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে ?
হে চৈত্র ! এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ আহা !—নাশিতে জীবন,
রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন !

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে—"কি কর কি কর।"
নব-উষা বলে—"ক্রোধ সম্বর সম্বর।"
কোকিল ডাকিল মুহু করিয়া মিনতি,
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি।
বৃথা। বৃথা। বৈশাখের ত্রিচক্ষু হইতে
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে আচম্বিতে !
ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস ! হ'য়ে অনাথিনী
মুছিল সিন্দুরবিন্দু, বাসন্তী যামিনী !
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল খসিয়া,
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া !
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,
ভিজিল শিরীষ পুষ্প নয়নের নীরে !

আম্রের বাছনীদের সু-হরিত দেহ
ভরি' গেল রক্ত-পীতে খসি' গেল কেহ !
কঠিন উপলে বসি' সারস সারসী
বিহগ-ভাষায় ডাকে—"কোথায় সরসী ?"
গহন অরণ্যে ছায়া পলাল তবাসে,
ক্লান্ত পান্থ ভ্রান্ত হ'য়ে আতপে সন্তাষে !
লতিকা পড়িল লুটি' তরুর চরণে ;
বনস্থলী পতিহীনা নবীন যৌবনে।
দিন বলে, "এবে আমি খেটে হব সারা,"
রাত্রি বলে, "হায় আমি এবে আয়ুহারা।"
দম্পতি, যুকতি করি' "বিরহে" ডাকিল,
"কল্পনা"—কবির বধূ—বিদায় মাগিল !

কবি রবীন্দ্রনাথের—

শরতে সে শিউলি বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্‌গুনে তার বরণমালা খানি
পরাল মোর শিরে।

এই কবিতায় আমরা ঠিক এই জাতীয় কল্পনার পরিচয় পাই।

বহিঃপ্রকৃতির সহিত কবির মনের আদান-প্রদান দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় যথেষ্ট পাওয়া যায়—

প্রকৃতির সাথে হয় কবিচিত্ত বিনিময়
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন।

এখানে বিশ্বপ্রকৃতির ব্যক্তিত্বের ধারণাটিও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে।

কবি বিহারীলালের কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ও বিশ্বপ্রকৃতি বর্ণনার যে অভিনব ধরণ ফুটিয়াছিল তাহা চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-জীবনে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতায় প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দের লীলা চলিতেছে তাহার সহিত মানব-মনের আনন্দের যোগের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির যে প্রাণস্পন্দন শুনিতে পাইয়াছেন তাহা খুবই স্বাভাবিকভাবে তাঁহার কাব্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাইয়াছেন যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবের পরিচয় কেবল ইহ জগতের নয়—কবি ইহা উপলব্ধি করেন যে উদ্ভিদ জগতে ও প্রাণীজগতে আজিকার মানবের এই প্রাণই বিকাশের স্তরে স্তরে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্যই কবির কাছে তৃণের শিহরণ, কুসুম-মুকুলের ফুটিবার আনন্দ, সমুদ্রের কলরোল এত পরিচিত ও এত অর্থভরা। প্রকৃতি-পরিচয়ের এই গভীরতা রবীন্দ্রনাথের বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি ("সোনার তরী"), সমুদ্র ("পূরবী"), অহল্যার প্রতি ("মানসী") প্রভৃতি কবিতাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতির গোপন বাণী ও সুরতরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নূতন করিয়া বাজিয়াছে। যে প্রকৃতিকে আমরা নিত্যনিরন্তর আমাদের চোখের সম্মুখে দেখিতেছি তাহার সহিত তিনি আমাদের নূতন করিয়া পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবি-কল্পনা যেন বিশ্বপ্রকৃতিকে পুনঃসৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনের একেবারে প্রথম ভাগ হইতেই তাঁহার উপর প্রকৃতির প্রভাব অসাধারণ। মাত্র চৌদ্দ বৎসরের লেখা রবীন্দ্রনাথের "বনফুল" (অধুনা লুপ্ত) কাব্যখানির মধ্যেও স্থানে স্থানে যে রকম চমৎকার প্রকৃতি-বর্ণনা আছে তাহা কবির ভবিষ্যৎ

সূচিত করিয়াছিল। তথাপি "বনফুল" রচনার সময় হইতে "সন্ধ্যাসঙ্গীত" রচনার সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধানত মানবের কবি। তখন মানব-সম্বন্ধীয় কল্পনা তাঁহার কাব্যে যেটুকু রূপ পাইয়াছে প্রকৃতি সেটুকু রূপ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে তখন প্রকৃতির সার্থকতা যেন মানবকে পাইয়াই।—মানবহীন প্রকৃতি যেন তাঁহার কাছে ব্যর্থ ও মাধুর্যহীন। "সন্ধ্যাসঙ্গীতে" কবি হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে ব্যাকুল হইয়া প্রকৃতির মাধুর্যময় রূপটি খুঁজিয়াছেন—মাঝে মাঝে তাহাকে পাইয়াছেন, মাঝে মাঝে হারাইয়াছেন। "সন্ধ্যাসঙ্গীতে" কবির সহিত প্রকৃতির প্রথম প্রণয় জন্মি-তেছে—সেই জন্ম সেখানে প্রকৃতির সহিত বিচ্ছেদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র সংশয়পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তেও কবির মনে হইয়াছে—

সমীর কোমল মন
আসে হেথা অনুক্ষণ,
যখনি সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে
যখনি সে জেগে উঠে
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ,
দুই বাহু প্রকাশিয়া
আমারে বুকেতে নিয়া
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়।

তবে প্রকৃতির সহিত পরিচয়সূত্র স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও কবি বলিয়াছেন—

শুধু মনে জাগে এই ভয়,—
আবার হারাতে পাছে হয়।

"প্রভাত সঙ্গীত" হইতে দেখি যে প্রকৃতির সহিত মিলন-ব্যাকুল কবি প্রকৃতির অন্তঃপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। 'প্রভাত উৎসব' নামক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এখান হইতে কবি আপন ক্ষুদ্র অন্ধকারময় জগৎ ছাড়িয়া প্রকৃতির আলোকময় জগতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। "প্রভাত সঙ্গীত" এবং তাহার পরবর্তীকালের সকল কাব্যেই যে-সব প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতা আছে তাহাতে প্রকৃতির সহিত যোগের আনন্দ অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবির কুঞ্চিত হৃদয় প্রকৃতির প্রসার ও স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিযাছে এবং কবির অন্তর প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া অপূর্ব ছন্দে ও গানে স্রোতস্বিনীর মত গলিয়া ছুটিয়াছে।

বহু কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহিত একাত্মতা বোধ করিয়াছেন এবং নিজেকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে বিলাইয়া দিবার তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতার বিশিষ্টতা এই যে তাঁহার কাছে মানবীয় অনুভূতির মাঝে প্রকৃতির সার্থকতা। সেই জন্য কবি মানবীয় অনুভূতির ব্যঞ্জনা দিয়া প্রকৃতিকে অনুভব করেন। কাব্যের এই বিশিষ্টতা যে আধুনিকতার লক্ষণ ইহা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সন্ধ্যাসঙ্গীত" হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রভাত সঙ্গীত" "ছবি ও গান", "মানসী", "সোনার তরী", "চৈতালি", "কল্পনা", "ক্ষণিকা", "নৈবেদ্য", "বলাকা", "বনবাণী" প্রভৃতি কাব্যে বিবিধ রূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বিশ্বপ্রকৃতিকে এইরূপ বিচিত্র ও অভিনব রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের উপর প্রকৃতির

প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিচিত্র ও অপরূপ বিশ্বপ্রকৃতি নানা ভাবে এই কবিকে কত কি ইঙ্গিত করিয়াছে—

সাঁঝে আজ কিসের আলো,
ভুলালো মন ভুলালো।
মরি কার পরশমণি
গগনে ফলায় সোনা!
হৃদয়ে নূপুর ধ্বনি
অজানার আনাগোনায়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং বিচিত্র মধুর ছন্দে প্রকৃতির প্রাণের সাড়া রূপবৈচিত্র্য ও লাস্য লীলা তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

পরাণ আমার শুনেছে সে মধু বাণী
ধরিবারে তাই চাহে সে তাহারে গানে,
হে মানসী দেবী, হে মোর রাগিণী-রাণী।
সে কি ফুটিবেনা বেণু ও বীনার তানে?

বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বানে কবির ঘরে থাকাই দায় হইয়াছে—

পারব না আজ ঘরে একলাটি রইতে
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।

* * *

খিল খোলা পর্দাতে যাব চল্ সাধ জেগেছে।
রইবে কে ঘরে আজ চাঁদ ডেকেছে!

কবি রবীন্দ্রনাথও এইরকম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং তিনিই সত্যেন্দ্রনাথের মত কবিপ্রাণকে ঘর ছাড়িয়া

বিশ্বশোভায় নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য ডাক দিয়া বলিয়াছেন—"ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।"

এবং—

> ওগো মা মৃন্ময়ী
> তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই
> দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
> বসন্তের আনন্দের মতো · · · · —বসুন্ধরা

প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নৃত্যচ্ছন্দ গভীর ভাবে অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনার মধ্যে তাঁহার দেওয়া চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'আবির্ভাব', 'নববর্ষা' প্রভৃতি কবিতার মত একটি অপূর্ব সঙ্গীতধ্বনি অনুভব করি। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার অন্তরের পরিচয় খুব গভীর। সেইজন্য তাঁহার কাব্যে ও ছন্দে প্রকৃতির অন্তরতম বাণীর অনুরণন জাগিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে মানবীয় অনুভূতির মাঝেই প্রকৃতি সার্থক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কবিগণও ঐরূপে বিশ্বপ্রকৃতিকে মানবীয় ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়াই দেখিয়াছেন এবং তাহাতে এই সব কবিদের কল্পনার প্রসারতা ও আধুনিক কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি করুণানিধান রূপদক্ষ শিল্পীর মতো কাব্যের মার্জিত ভাষায় বিশ্বপ্রকৃতির যে কোনও চিত্রকে অপূর্ব রূপে ও রঙে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। ইঁহার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতাতে ভাব অনুযায়ী ভাষার ভঙ্গীর জন্য চমৎকার কাব্য-রসের উৎপত্তি হইয়াছে।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'কন্যা শরৎ', 'শিউলির বিয়ে', 'শ্রাবণ

রজনী', 'বসন্ত আগমনী', 'বাদলরাতের গান', 'ঘুঘুর ডাক' প্রভৃতি কবিতার ভাব, ভাষার দীপ্তি ও ছন্দমাধুর্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাতেও বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দধারা বেশ রসমণ্ডিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথ সেনের কবিকল্পনা ভিন্ন ধরণের ও অভিনব ধরণের। বাংলা সাহিত্যে ইনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি প্রকৃতি হইতে একটি নূতন পরিচয় ও নূতন অর্থ পাইয়াছেন। অন্যান্য কবিগণ প্রকৃতির অন্তরে যে আনন্দ-রসধারা অহর্নিশ প্রবাহিত দেখিতে পাইয়াছেন ইঁহার কল্পনা সে দিকেই যায় নাই—যাহা কিছু আনন্দের তাহা ইঁহার কাব্যের উৎস নয়—তাহার প্রতি এই কবির পক্ষপাত কিছুমাত্র নাই। তিনি প্রকৃতির মধ্যে দুঃখ বিরোধ ও আঘাত-কেই দেখিয়াছেন। প্রকৃতির অনির্বচনীয় ও রহস্যময় রূপের মধ্যে তিনি দুঃখই দেখিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি হইতে তাঁহার কল্পনার বিশিষ্টতা-টুকু বোঝা যাইবে—

তারই 'পরে কোপ গো বন্ধু, তারই 'পরে তব কোপ,
যে জন কিছুতে গিলিতে চায়না এই প্রকৃতির টোপ।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল।
ছবি ও ছন্দে তোমার দালালি করিছে স্বভাব-কবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে ভবি ভুলিবার নয়;
সুখদুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।

• • •

ফাল্গুনে হেরি নব কিশলয় যাহা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা শীর্ণ পাতার কাহিনী না মনে আসে,

ফল দেখে 'যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী !'

যতীন্দ্রনাথ সেনের এই সব বিশিষ্ট ধরণের কল্পনাপ্রসূত প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি হইতে চমৎকার কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, যেমন—

কাল এসেছিল ফাগুন সন্ধ্যা,
ফুটেছিল তাই রজনীগন্ধা ,
রূঢ় বিদ্রূপে বাদল বাতাস
দিয়ে যায় তারে ঠেলা—
কে দেখে রে তার বুক ছেপে ছেপে
নীরবে অশ্রু ফেলা !

—অকাল বর্ষায় (মরীচিকা)

তাঁহার অনেক কবিতাতেই এইরূপ দুঃখের ছবিটি ভেদ করিয়া চমৎকার কবিত্বরস উৎসারিত হইয়াছে। কবির সকল কবিতাতেই দেখা যায় যে ইনি প্রকৃতির উপর একটি সকরুণ বিষাদময় ভাব আরোপ করিয়াছেন এবং সেই সব কবিতা হইতে একটি অভিমানরঞ্জিত ও বেদনাসিক্ত অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। অবাস্তব-সৌন্দর্যের মোহে ইনি বিশ্বপ্রকৃতির দুঃখের দিকটি দেখিতে ভোলেন নাই। দুঃখ ও আঘাতের চিত্রকে তিনি অপূর্ব কাব্যকুশলতার দ্বারা রসমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাকেও একপ্রকার idealistic কল্পনা বলা যায়।

বিশ্বপ্রকৃতি অতি পুরাতন এবং মানুষের সৌন্দর্যসম্ভোগ করিবার প্রবৃত্তিও তাহার আদিমতম প্রকৃতি। এইজন্য নূতন ভাবে সেই সৌন্দর্য-বোধের আনন্দ ব্যক্ত করা কবিদের একটি কঠিন সাধনার বিষয় হইয়া আছে। সেইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথ সকল কবির হইয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

হায় কবি হায়, সে হ'তে প্রকৃতি হ'য়ে গেছে সাবধানী,
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপর আঁচল দিয়াছে টানি'।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি প্রকৃতির পিছু পিছু,
কোনদিন কোন গোপন খবর নূতন মেলেনা কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে।
মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভরা,
হায় কবি হায়! হাতে হাতে তার কিছুই পড়ে না ধরা।

এই বিশ্বপ্রকৃতিকে বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করিবার ও পরিপূর্ণরূপে অনুভব করিবার সহজাত ক্ষমতা যে কবির যত বেশী আছে তিনি তত বড় কবি ও স্রষ্টা। আধুনিক কবিদের হাতে—বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার রশ্মিপাতে বিশ্বপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতায় বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"A nation is known by its theatre"—অর্থাৎ রঙ্গালয় জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি। সুকুমার শিল্পের চর্চা যে জাতির মধ্যে যত অধিক সেই জাতি তত অধিক উন্নত। রঙ্গালয় সুকুমার শিল্পের পীঠস্থান এবং নাট্যসাহিত্য রঙ্গালয়ের প্রাণ। নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষতায় ও অস্তিত্বে রঙ্গালয়ের খ্যাতি ও অস্তিত্ব। সুতরাং নাটক হইতে জাতির শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায়।

সাহিত্যজগতে নাটকের স্থান অতি উচ্চে। নাট্যসাহিত্য জাতির পরিণত অবস্থার প্রতিচ্ছবি। সকল জাতির সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জাতি যখন সাহিত্য-সৃষ্টির উচ্চতম শিখরে উন্নীত, তখনই নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, জাতির শৈশবে ও কৈশোরে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়, জাতির যৌবনে নাটক। নাটকে আত্মনিমগ্ন কবিত্বশক্তি অপেক্ষা দৃষ্টি-শক্তির অধিকতর প্রয়োজন। সকলপ্রকারের মানবচরিত্র সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান ও সহানুভূতি এবং স্বভাব-সঙ্গত চরিত্র সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, ভাব-প্রকাশের শক্তি এবং সংযম, ঘটনা-সৃষ্টি-করিবার সামর্থ্য, ঘটনা সন্নিবেশে নৈপুণ্য এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে পরিহার করিবার শক্তি নাটক রচনাতে বিশেষ প্রয়োজন।

নাট্য-সাহিত্যে একটি ঘটনা-পর্যায়কে বিভক্ত করিয়া লইয়া তাহার নিবিড় বিকাশের মধ্য দিয়া রসের পরিণতিকে অবিচ্ছেদে দেখাইতে হয়।

নভেলে নানা বর্ণনা থাকে, চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘটনা-বাহুল্যের সমাবেশ চলে—নভেলের মধ্যে মানবমনের যে সকল সূক্ষ্ম রহস্য ও ঘাত-প্রতিঘাত চোখে দেখা যায় না তাহারও আলোচনা থাকে। উপন্যাস-লেখক নরনারীর চরিত্রের অগোচর মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যাত ও বিবৃত করিয়া চলেন। কিন্তু নাট্যকার তাহা করেন না। নাটকের ঘটনাসংস্থানে যথেষ্ট কৃতিত্বের প্রয়োজন। একটি ঘটনার পার্শ্বে আর একটি ঘটনাকে সাজাইয়া দিয়া নাট্যকারের নিষ্কৃতি নাই, একটির সহিত আর একটিকে প্রাণগত বন্ধনে এমন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে যে সমস্ত নাটকের ঘটনা যেন অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছেদ্য সজীব দেহরূপে আপন আত্মাকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করিতে পারে। নভেলের মধ্যে যেরূপ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অমলিন ছায়াসম্পাত, নাটকেও অবশ্য সেইরূপই—অর্থাৎ নাটক এবং উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন "জীবন" এবং "লোকপ্রকৃতি"। তবে নাটকে এবং নভেলে এই লোকপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রণালী বিভিন্ন।

জীবনের দুইটি দিক্। একটি কর্মময় এবং একটি মনোময়। জীবনের এই কর্মপ্রধান অংশটি নাটকের ক্ষেত্র। এক কথায় ইংরেজীতে যাহাকে বলে Action এই Action বা কার্যই নাটকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে। উপন্যাসে থাকে ভাব ও ঘটনার বিবৃতি, আর নাটকে আছে কথা ও কাজের সাহায্যে বাস্তব ঘটনার অনুবৃত্তি বা অনুকরণ। নাটক দৃশ্যকাব্য।—যাহা দেখা যায় সেই উপকরণ লইয়া, যাহা দেখা যায় না সেই ভাবরসকে নাটকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। এই বিশিষ্টতার জন্য নাট্যসাহিত্য নিজ স্বতন্ত্র পথ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাটকের বিশেষ অভাব থাকিলেও, নাটক রচনা আমাদের দেশে নূতন নহে। সংস্কৃত সাহিত্য দৃশ্যকাব্যে এরূপ সমৃদ্ধ ছিল যে গ্রীক সাহিত্য ভিন্ন বোধ হয় আর কোন প্রাচীন সাহিত্য সেরূপ

ছিল না। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বাংলা নাটক রচনার সূচনা হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আধুনিক বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের প্রতি নবোদ্দীপিত অনুরাগ হইতে আমাদের দেশীয় নাট্যশালার উদ্ভব হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে নাটক রচনার প্রথম যুগে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত আদর্শে বাংলা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে সংস্কৃত আদর্শে নাটক রচনাতে নাট্যসাহিত্যের সম্যক উন্নতি ও স্ফূর্তি সম্ভব ছিল না। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ভাব ও অলঙ্কার সম্বন্ধে কোনও ধরা-বাঁধা নিয়মের বশবর্তী হইয়া নাটক রচনা বিধেয় নহে। নাট্যকারের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে পাত্র-পাত্রীগণের প্রকৃতির উপর। যেখানে পাত্র-পাত্রীগণ আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাভাবিক কথাবার্তা বলিবে নাট্যকার তাহাকেই লিপিবদ্ধ করিবেন। পাত্র-পাত্রীগণের মুখ দিয়া শুদ্ধ ও অলঙ্কার-শোভিত বাক্য প্রকাশ করাইলে অথবা নায়ক নায়িকার চরিত্রাঙ্কণ করিবার সময়ে তাহাদের যদি অনুচিত পরিমাণে গুণবিশেষ অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে চরিত্রচিত্রণ কল্পিত অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম হইয়া উঠে। অলঙ্কারের আদর্শ অনুযায়ী ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করিলে রচনা অস্বাভাবিক হইবার সম্ভাবনাই অধিক। এজন্য নাটকে ঘটনা-সংস্থানের সময়ে ও চরিত্রাঙ্কণের সময়ে নাট্যকারের সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা প্রয়োজন।

এইরূপে সংস্কৃত আদর্শের নাটক রচনার মধ্য হইতে কখন প্রথম পাশ্চাত্য আদর্শের নাটকের উদ্ভব হয় তাহা বলা কঠিন। তবে রামমোহন রায়ের পরিচালিত "সংবাদ কৌমুদীতে" (১৮১২ খৃঃ অঃ) আমরা "কলিরাজ যাত্রানাটক" নামে একখানি পাশ্চাত্য আদর্শের নাটকের উল্লেখ

পাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না বলিয়া এখানিকে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রথম নাটক বলিয়া গণ্য করা বোধ হয় সমীচীন নহে। জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজের গণিত-শিক্ষক তারাচরণ শিকদারের "ভদ্রার্জুন" নাটকই সম্ভবতঃ বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে রচিত সর্বপ্রথম নাটক।

প্রথমে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে বাংলা নাটক রচনা হইত তখন সেই সকল নাটকের প্রারম্ভে সংস্কৃত নাটকের ন্যায় নান্দী ও প্রস্তাবনা থাকিত। নান্দী ও প্রস্তাবনা বর্জিত ইংরেজী আদর্শের প্রথম নাটক "ভদ্রার্জুন"। ইহা ব্যতীত, এই নাটকে ইংরেজী পদ্ধতি অনুসারে প্রতি অঙ্ককে বিভিন্ন দৃশ্যে ভাগ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক পর্যায় ক্রমে দেখিতে গেলে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে এই নাটকখানির বিশেষ মূল্য আছে। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্তই আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের অগ্রদূত। কারণ তিনি তাঁহার রচিত নাটকগুলিতে রচনারীতি চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাবিন্যাসের বেশ একটি পরিষ্কার আদর্শ সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উপস্থিত করিয়াছিলেন।

এজন্য বলা যায় যে প্রকৃতপক্ষে মাইকেলের সময় হইতেই বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। মাইকেলের পূর্ব পর্যন্ত কেবল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের রচিত সংস্কৃতরীতির নাটকেরই অভিনয় হইত। তাহার মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের "রত্নাবলী", "অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক", "নবনাটক", "মালতীমাধব নাটক", "রুক্মিণী-হরণ নাটক", "কুলীনকুলসর্বস্ব" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাট্যকার তাঁহাদের নাটকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশিকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু মাইকেলের নাট্যকলায় আমরা সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণভাবে ঘটনা-সংস্থান করিবার শক্তির পরিচয় পাই। মাইকেল বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন আদর্শ ও নূতন পদ্ধতি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। ইংরেজী আদর্শে

নাটক রচনাতে মাইকেলের সাফল্য হইতে প্রমাণিত হইল যে অতঃপর নাট্যসাহিত্য-সৃষ্টির জন্য ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রতিভাবান্ নাট্যকারগণকে অনেক অনুপ্রেরণা লইতে হইবে এবং ইংরেজী নাটকের আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত করিতে হইবে।

মাইকেলের প্রতিভা ভিন্ন সেই সময়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালাও (১৮৫৮ খৃঃ) আধুনিক বাংলা নাটকের পরিপুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। এই নাট্যশালা স্থাপিত হয় মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সমবেত চেষ্টায়। এই নাট্যশালাই আমাদের দেশে বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয়ের পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদের বহুকালবিস্মৃত নাট্যসাহিত্যের পুনঃপ্রবর্তনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি মাইকেলেরও প্রতিভা-বিকাশে সহায়তা করিয়া এই নাট্যশালা বাংলা নাট্যসাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। এই নাট্যশালা কেবল সংস্কৃত রীতির পক্ষপাতী নাট্যকারগণকে সমাদর করিয়া নিরস্ত হয় নাই, ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ দীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতিভা-বিকাশেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল নাটক রচনা হইতে। তাঁহার প্রথম নাটক "শর্মিষ্ঠা" ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং তখন হইতে বাংলা নাটকের নবযুগের আরম্ভ। এই নাটকখানি রচনা করিয়া মাইকেল মধুসূদন যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বোঝা যাইবে কেন তিনি ইংরেজী রীতি ও ভাব অনুসারে নাটক রচনা আরম্ভ করেন।—"আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্যই লিখেছি যাঁরা আমার ভাবেই ভাবুক, যাঁরা ন্যুনাধিক পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য নিয়মেই চিন্তা করেন। প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের অনুকরণ ক'রে ক'রে আমাদের চিন্তার চরণে যে শৃঙ্খল পড়েছে তাকে সর্বপ্রথমে দূর

করাই আমার উদ্দেশ্য।" শেক্সপীয়ার যেমন গ্রীক নাট্য-শাস্ত্রের স্থান কালের ঐক্য-আদর্শকে ইংরেজী নাটকে বর্জন করিয়াছিলেন, মধুসূদনও তেমনই বাংলা নাটক রচনা করিতে গিয়া সংস্কৃত নাটকের অলঙ্কার ও অঙ্কের আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রয়োগ-রীতির দিক দিয়া তাঁহার রচিত "শর্মিষ্ঠা" নাটকখানি সংস্কৃত অলঙ্কারের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। এ নাটকে প্রস্তাবনা ও নান্দী নাই, আর সংস্কৃত নাটকের ন্যায় সূত্রধরের প্রবেশও নাই এবং প্রত্যেক অঙ্ক বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত। "শর্মিষ্ঠা" নাটকখানিতে নাট্যশিল্পের যে আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় রোমাণ্টিক নাটকের আদর্শের অনুরূপ। মাইকেল মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিক নাটকের সূত্রপাত করেন। "শর্মিষ্ঠা" নাটকখানি মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। খুব সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে অবশ্য তাঁহার এই নাটকখানিতে সাহিত্যশিল্পের বহু দোষ-ত্রুটি ধরা পড়িবে। এই নাটকখানির মধ্যে নাটকোচিত আদর্শ অপেক্ষা কবিত্ব অনেক বেশী পরিমাণে বর্তমান। বাহুল্যময় প্রকৃতি-বর্ণনা এবং ক্রমাগত স্বগত উক্তিদ্বারা নায়ক-নায়িকার আত্মপরিচয় দান প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক রচনার আদর্শকেই মনে করাইয়া দেয়। তবে আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নাট্যকারের রচনা হইতে তিনি নাটক রচনার কোনও উচ্চাঙ্গের আদর্শ পান নাই। তাঁহাকে যেরূপ শীঘ্র নাটকের form-কে গড়িয়া লইতে হইয়াছিল, তেমনই চরিত্র-চিত্রণের আদর্শকে, ভাষা ও ভাবুকতার আদর্শকেও সৃষ্টি করিয়া বঙ্গবাসীকে দেখাইতে হইয়াছিল।

"শর্মিষ্ঠা" নাটক রচনার পরে মধুসূদন "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" নামক দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। প্রথমোক্ত প্রহসনে তিনি তৎকালীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যুবকগণকে বিদ্রূপ

করিয়াছেন। মাইকেলের অন্যান্য সকল নাটকই ভাবুকতার জন্য অল্পবিস্তর কবিত্বময় হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবজীবনের গূঢ়তত্ত্ব বিশ্লেষণে তিনি এই দুইখানি প্রহসনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন অতি অল্পই রচিত হইয়াছে।

নাটক রচনায় উৎসাহ পাইয়া তিনি "পদ্মাবতী" নাটক রচনা করেন। এই নাটকে তিনি গ্রীক পুরাণ হইতে নাট্যবস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নাটকের আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া গ্রীক অদৃষ্টবাদকে বাংলা সাহিত্যে অবতারিত করিয়াছেন। অদৃষ্টের তাড়নায় চরিত্রগুলি কিন্তু ঠিক স্বভাব-সঙ্গত হয় নাই। "পদ্মাবতী" নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি গ্রীক "Apple of Discord"-এর কাহিনীর আভাষ দেয়। শচী, রতি ও মুরার চরিত্র হেরা, আফ্রোডিট্ ও পালাস্ আথেনীর চরিত্রের অনুরূপ। কেবল সোনার আপেলের জন্য দ্বন্দ্বটিকে এই নাটকের পদ্মের জন্য দ্বন্দ্বে পরিণত করা হইয়াছে। এই নাটকের মধ্যেও মধুসূদনের কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাই-য়াছে। মাঝে মাঝে বেশ ভাবুকতাময় উচ্ছ্বাস আছে। এই নাটকটির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে ইহাতে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে সেই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা। মাইকেল বলিয়াছিলেন "অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে না পারিলে বাংলা নাটকের কদাপি উন্নতি নাই।" অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করায় মাইকেলের "পদ্মাবতী" নাটকখানি বেশ একটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ-যুগের নাট্যসাহিত্যিকগণের জন্য তিনি একটি নূতন ধরণের রচনাদর্শ দিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন তাঁহার নাটকে কেবল মনুষ্যজীবনের বাস্তবচরিত্র অঙ্কিত করিয়া Illusion of reality সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। মানুষের চিত্তের মধ্যে যে ভাবচ্ছন্দ আছে, সেই ভাবচ্ছন্দকে আয়ত্ত করিয়া তিনি

নরনারীর জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যটুকুকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভাব-প্রকাশের একটি শ্রেষ্ঠ প্রণালী। বাধামুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার দ্বারা ভাবের মধ্যে বেশ একটি সৌকর্য আসিয়া থাকে—নাটকের ভাবপ্রবাহে বেশ একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ আসিয়া থাকে। যে-সকল নাটকের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সে-সকল নাটকেই ঘটনার সহিত ভাবুকতার বেশ একটি সুসামঞ্জস্য দেখা যায়—সে-সকল নাটকে realism এবং naturalism-এর সঙ্গে idealism-এর বেশ একটি স্বাভাবিক ও সুসামঞ্জস্যময় মিলন ঘটিয়াছে। অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিলে নাট্যসাহিত্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক হয় না।

উল্লিখিত চারখানি নাটক রচনা করিবার পর মাইকেল তাঁহার সর্বশেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট নাটক "কৃষ্ণকুমারী নাটক" রচনা করেন। এই নাটকখানি বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক ও করুণরসাত্মক নাটক। কেবল বঙ্গসাহিত্যে নয় – ভারতীয় সাহিত্যেও কোনদিন করুণরসাত্মক নাটক প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। এই হিসাবেও এখানি বাংলা-সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়া নাট্যসাহিত্য-শিল্পের একটি নূতন আদর্শ প্রবর্তিত করিয়াছিল।

"কৃষ্ণকুমারী" নাটকখানি রোমান্টিক্ ট্র্যাজেডি। এই নাটকখানিতে যে কেবল form এবং আদর্শের দিক দিয়া বিশিষ্টতা ও নূতনত্ব আছে তাহা নহে। এই নাটকখানির মধ্যে পরিকল্পনা ও চরিত্রচিত্রণ-শক্তির বহুল পরিচয় আছে। "কৃষ্ণকুমারী" নাটকখানি রচনাপ্রসঙ্গে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—"শর্মিষ্ঠা" নাটকে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কবির ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, কবিত্বের অনুরোধে আমি সত্যকে বিস্মৃত হইয়াছি। এই নাটকে আমি নিজের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমি কবিত্বের জন্য চতুর্দিক অনুসন্ধান

করিয়া চলিব না। অবশ্য আপনা হইতেই আসিয়া পড়িলে সেই কবিত্বকে পরিহার করিব না।—বাস্তবিকই এই নাটকে চরিত্র সৃষ্টি খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। "কৃষ্ণকুমারী" নাটকটির ঘটনাটিকে তিনি বেশ ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মধুসূদন ছিলেন প্রধানত কবি—সেজন্য তাঁহার সকল নাটকেই অল্প-বিস্তর ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়। তিনি যে-সকল চরিত্র অঙ্কিত করিতেন তাহাদের মনোগত ভাবটুকু ফুটাইয়া তোলায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এজন্য স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টিতে মাইকেলের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সকল নাটকেই নিত্যদৃষ্ট পরিচিত চরিত্র বা ঘটনা মাত্রেই তাঁহার কাব্যপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এই idealism বা ভাবপ্রবণতা—এই romance বা কল্পনার বৈচিত্র্যটুকু তাঁহার নাটকের বিশেষত্ব। করুণ রসোদ্রেকে মাইকেলের যে কৃতিত্ব ছিল এবং "কৃষ্ণকুমারী"তে যাহা একটি বিশেষত্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও তাঁহার এই ভাবপ্রবণতার তাড়নায় হইয়াছে। অনেক স্থলেই কবিত্বের তাড়নায় তিনি তাঁহার নাটকগুলিতে বাস্তব-জীবনকে বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে তিনি এই দোষটিকে পরিহার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাংলা নাটকের ক্রমপরিণতি কালবিভাগ হিসাবে ধরিলে, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং মাইকেল মধুসূদনের নাটক রচনার সময়কে (১৮৫৪—৬০ খৃঃ) সাধনার যুগ (Experimental stage) বলা যায়। কারণ এই যুগে নাটক রচনা করিবার পরিকল্পনা ভাষা রচনারীতি ও চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতির আদর্শ তখনও সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ করে নাই।

ঠিক এই যুগের প্রান্তসীমায় দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব। দীনবন্ধুর প্রতিভা দ্বারা বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য যে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে, তবে তাঁহার প্রতিভার বিশিষ্টতা বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যকে বহুস্থলে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

দীনবন্ধু বঙ্গসাহিত্যে প্রধানত হাস্যরসের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। কথাটি সত্য, কিন্তু সত্য হইলেও এই মতকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। দীনবন্ধুর সর্বপ্রথম রচনা হাস্যরসোদ্রেকের জন্য রচিত হয় নাই। তাঁহার "নীলদর্পণে"র ন্যায় করুণরসাত্মক নাটক বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

নীলকর-প্রপীড়িত দুঃস্থ প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া দীনবন্ধুর প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাহারই ফল "নীলদর্পণ"। নিঃসহায় দরিদ্র ও পীড়িতের মর্মবেদনা বোধ হয় সাহিত্যে অন্য কোথাও এরূপ সুন্দর ভাবে ফোটে নাই।

মানবজীবনের সুখদুঃখই সাহিত্যের উপজীব্য এবং মানবের মর্মবেদনা সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল অত্যাচার ও পীড়নের এরূপ জীবন্ত চিত্র, সাহিত্যে অধিক দৃষ্ট হয় না।

রামনারায়ণের অসম্পূর্ণতা এবং কবিত্বের জন্য মাইকেলের নাটকে যেটুকু কৃত্রিমতা দোষ লক্ষিত হইয়াছিল, উহা দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে লক্ষিত হয় না। তিনি তাঁহার "নীলদর্পণে" অতি অদ্ভুত চরিত্রচিত্রণ-শক্তি দেখাইয়াছেন এবং স্বাভাবিক ভাবে করুণরস উদ্রেক করিয়াছেন। বাস্তব-জীবন ও বাস্তব-চরিত্রের এরূপ জীবন্ত ও স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি বাংলা সাহিত্যে "নীলদর্পণ" রচনার পূর্বে আর দেখা যায় নাই। বর্ণনা-বৈচিত্র্য, বিষয়ের নবীনতা, চরিত্রাঙ্কণের নিপুণতা, সামাজিক অভিজ্ঞতা, অভিনব কল্পনা ও সহানুভূতি প্রভৃতি সকল দিক দিয়া "নীলদর্পণ" যে ক্ষমতা ও সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল তাহা ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। বঙ্গসাহিত্যে তিনিই প্রথম চরিত্রচিত্রণের একটি পরিষ্কার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার সকল নাটকেই প্রত্যেক চরিত্রের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা খুব নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টির সহিত দেখান হইয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকের মধ্যে আমরা যে সকল চরিত্রের সহিত পরিচিত

হই তাহাদের মধ্যে বেশ একটি আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আছে এবং বাস্তব-জীবনের সহিত একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রাঙ্কণেও দীনবন্ধুর অসামান্য ক্ষমতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। "নীলদর্পণে"—রাখাল বালক খালাসী, কবিরাজ, "নবীন তপস্বিনী"তে—পালকী বেহারা, গুরুপুত্র, বিদ্যাভূষণ, "লীলাবতী"তে - উড়ে বেহারা, "সধবার একাদশী"তে—বাম-মাণিক্য, দামা, ভোলা, বৈদিক ব্রাহ্মণ ও খোট্টা দ্বারবানের চিত্র সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় নাই। কবি অতি অল্প পরিসরের মধ্যে সামান্যতেই নাটকের প্রত্যেক পাত্রের সম্পূর্ণ ও নিখুঁত চিত্রটি দেখাইয়া দিয়াছেন এবং সে সকল চরিত্র নিজ নিজ বিশিষ্টতায় বর্ত্তমান থাকিয়া প্রধান কোনও এক চরিত্রের পরিস্ফুটনে সাহায্য করিয়াছে অথবা নাটকের মূল উদ্দেশ্যকে বিকশিত করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে তাঁহার "নীলদর্পণে"র একটি চরিত্র দেখা যাক। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এক খালাসীর চিত্র আছে। দৃশ্যটি উড্ সাহেবের কুঠির দপ্তরখানার সম্মুখ। উড্ সাহেবের অপেক্ষায় 'গুপে' এক খালাসীর সহিত আসিয়া উপস্থিত। গোপীনাথ খালাসীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোদের ভাগে কম না পড়্‌লে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্‌নে।" তিরস্কারের উত্তরে খালাসী মাত্র তিন পংক্তি জবাব দিল। সেইটুকুর জন্যই ঐ খালাসীর প্রয়োজন, এবং কেবল ঐ তিন পংক্তি কথার জন্যই নাট্যকার ঐ খালাসীর চরিত্রটি আঁকিয়াছেন। আর ঐ কথাটুকু বলাইয়াই তাহাকে দর্শকের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। সমস্ত নাটকে খালাসী আর কোথাও দেখা দেয় নাই। কিন্তু ঐ অল্প পরিসরের মধ্যে এই চরিত্রটী নিজেকে ফুটাইয়া গোপীনাথের স্বভাবের একটি দিক যে কিরূপ তাহাও সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছে এবং তাহার সহিত নাটকের বর্ণনীয় বিষয় নীলকরের কর্মচারীগণের অত্যাচারের কাহিনীও সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। খালাসী যাহা বলিল তাহাতে নীলকুঠির মধ্য মাছিটি পর্যন্ত

প্রজার রক্তশোষণের কিরূপ অংশভাগী এবং নীলকুঠির কর্মচারীবৃন্দের নিজেদের মধ্যে বিবাদের জন্য প্রজাদের কিরূপ পীড়ন হয় সে চিত্রটিও চমৎকার হৃদয়গ্রাহী হইয়া ফুটিয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকের প্রত্যেক চরিত্রই নিজ নিজ বিশেষত্বে মনোহর।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রত্যেকখানি নাটক realistic। চরিত্রাঙ্কণে তাঁহার নাটকে idealism বা ভাবপ্রবণতার প্রসার খুব অল্প। তাঁহার নাটকে এই জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

উপন্যাসের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার সফল প্রয়াস দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে করেন। তাঁহারই সমসূত্রে পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণ বহু সামাজিক নাটক রচনা করেন। কিন্তু ঐ ধরণের নাটক রচনায় দীনবন্ধু ছিলেন অগ্রদূত।

দীনবন্ধু মিত্রের পরে নাটক রচনায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি "কিঞ্চিৎ-জলযোগ", "পুরুবিক্রম", "সরোজিনী", "অশ্রুমতি" প্রভৃতি নাটক রচনা করেন এবং সেই সকল নাটকের ভাষা, ভাবপ্রবাহ, চরিত্রাঙ্কন এবং ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের শিল্পাদর্শের ও ভাবাদর্শের প্রবর্তন বেশ মনোরম হইয়াছে। উল্লিখিত নাটক কয়খানি রচনা করিবার পরে তিনি "স্বপ্নময়ী" নামক একখানি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিও রচনা করেন।

সাহিত্যশিল্পের কঠিন আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তবে নাট্যকার নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিয়া যান। তাঁহার রচিত "পুরুবিক্রম" ও "সরোজিনী" নাটকে গ্রীক নাটকের রচনারীতি অনুসৃত হইয়াছে "সরোজিনী" নাটক রচনাতে তিনি অনেক স্থানেই Euripides এর Iphigenia in Aulis নাটকটির অনুসরণ

করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে সফোক্লিস্ ও ইউরিপিডিসের রচনার আদর্শকে তিনি প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে তাঁহার প্রতিভা অনেক সহায়তা করিয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে মনোমোহন বসু "রামাভিষেক" "প্রণয়পরীক্ষা নাটক", "সতী নাটক", "পার্থপরাজয়", প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন এবং সেকালে তাঁহার বেশ খ্যাতিও হইয়াছিল। তাঁহার প্রায় সব নাটকই ইংরেজি অপেরা ধরণের। সেই নাটকগুলির মধ্যে গীতিবাহুল্য ঘটিয়াছে।

ইঁহার পরেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে অভিভূ'ত হন গিরিশচন্দ্র। প্রথমে ইঁনি কয়েকখানি বাংলা আখ্যায়িকা-মূলক কাব্য এবং উপন্যাস নাটকাকারে রূপান্তরিত করেন। মাইকেলের "মেঘনাদবধকাব্য", নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী", "বিষবৃক্ষ" ও "মৃণালিনী" উপন্যাস কয়খানিকে ইনি অভিনয়োপযোগী নাটকের আকার দান করেন। ইনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছিলেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক সর্ববিধ আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ইনি বহু নাটক রচনা করেন এবং সেগুলিতে তাঁহার যথেষ্ট নাটকীয় প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে।

মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেই মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া এই ছন্দে নাটক রচনা করিবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দিয়া যান।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকে নরনারীর চরিত্র সম্বন্ধে বেশ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন এবং কি ঐতিহাসিক, কি পৌরাণিক, কি সামাজিক— সকল প্রকার নাটকের ঘটনাবিন্যাসেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনা করিবার প্রণালীর উপর মাঝে মাঝে এলিজাবেথান্ যুগের নাট্যকারদের বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষত গিরিশচন্দ্রের নাটকের যে-সকল স্থানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন সেই স্থানগুলি এলিজাবেথান্ নাট্যকারদের কথা মনে করাইয়া দেয়।

মধুসূদনের সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়-কালের মধ্যে যে সকল সাহিত্যিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও রচনার সফলতায় বঙ্গসাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাটক রচনা আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাটক বাংলা নাটকের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করিয়া নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। ইঁহাদের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক এবং প্রহসনগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিশেষত্ব আমাদের চোখে না পড়িয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি ঘটনা প্রধান নহে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি নাটককে গীতিনাট্য বা লিরিক নাটক বলিতে হয়। আর কতকগুলিকে রূপক-নাট্য বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা", "বাল্মিকী-প্রতিভা", "রক্তকরবী", "বিসর্জন", "মালিনী", প্রভৃতি গীতিনাট্যের পর্যায়ভুক্ত। বাহিরের ঘটনা-স্রোতের উপরে এই লিরিক নাটকগুলি নির্ভর করে না। হৃদয়াবেগ এই সকল নাটকের প্রধান উপকরণ। ইহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের আরম্ভ "শারদোৎসবে" এবং ইহারই পর্যায়ভুক্ত "অচলায়তন", "ডাকঘর", "মুক্তধারা" প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা ঘটনাগত নহে, ভাবগত। উপন্যাস রচনায় যে বিশিষ্টতার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাফল্যলাভ করিয়াছেন সেই বিশেষত্বটুকু রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনাকেও সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। উপন্যাস এবং নাটক এই উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সেখানে সাফল্যলাভ করিয়াছেন যেখানে এক একটি চরিত্রের মধ্যে মানবচিত্তের অতি সূক্ষ্ম ভাবরহস্যকে তিনি রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। এইভাবে তাঁহার নাটক রচনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে গিয়া কবিকে নাটকের এক নূতন রূপ এবং অভিনব ভঙ্গিমার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে কোনও বিশেষ প্লট বা গল্প নাই—শুধু আছে একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করা। য়ুরোপীয় সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক্‌, ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গ, ইয়েট্‌স্‌ প্রভৃতি নাট্যকারগণও রূপকনাট্য রচনা করিয়াছেন। এই ধরণের নাটককে নাটক বলিতে কাহারও কাহারও আবার বেশ আপত্তিও আছে। অনেক সমালোচকেরা এই ধরণের নাটককে no-plot-plays বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্টভাবের বিশিষ্ট প্রকাশের জন্য এই সকল সাহিত্যিকগণ এই রূপক নাট্যের ভঙ্গীমাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকে সৌন্দর্যময় মানবজীবনকে ততটা স্থান দেন নাই, যতটা চাহিয়াছেন সৌন্দর্যের উৎসটিকে জানিতে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে সামাজিক সমস্যার উপরে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইয়াছে—যেমন পটের উপর চিত্র, তাহাতে চিত্রটিই প্রধান হয়, পট নহে।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান্‌ নাট্যকারগণের প্রচেষ্টায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিষয় ভাব ও রচনারীতির দিক দিয়া বিচিত্রতা আসিয়াছে—চরিত্রসৃষ্টি এবং ঘটনাবিন্যাসের আদর্শেরও ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। form এবং technique সম্বন্ধে বাংলা নাট্যসাহিত্যে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা আসিয়াছে।

বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

বর্তমান যুগে—অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিলমোহরে যদি 'শ্রী' এবং 'পদ্ম' একসঙ্গে থাকে, তাহা হইলে কোন কোন মুসলমান তাহাতে আপত্তি করেন। উহা না কি হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু মুসলমানগণের এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব চিরদিন ছিল না। এই বঙ্গদেশে এমন এক দিন ছিল, যখন হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় পরম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আনন্দের স্রোতে দিন কাটাইয়া দিত। উভয় সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে অথবা উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান অনন্দ উপভোগ করিত। দোল-দুর্গোৎসবের সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদের উৎসবের আনন্দে যোগ দিত—আবার হিন্দুরা মহরমের সময়ে মুসলমানদের মত লাঠি খেলিয়া এবং আমোদ করিয়া দিন কাটাইত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কি গভীর হৃদ্যতাই না সেকালে ছিল। এ সম্বন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"মুসলমানগণ ইরাণ তুরাণ প্রভৃতি যে-স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু-প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মস্‌জিদের পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।"

খৃষ্টীয় চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে বঙ্গদেশে বহু মুসলমান শাসনকর্তা শাসন করিয়াছিলেন। ঐ সকল মুসলমান শাসকের উৎসাহে মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য শুধু যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে। ঐ যুগে বহু মুসলমান কবি বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য বাঙ্গলায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে দান অবহেলা করিবার নহে। এই সকল মুসলমান কবিগণের অধিকাংশই আবার বৈষ্ণবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন—তাঁহারা বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল কবিতা ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের গভীরতায় এবং ছন্দের মাধুর্যে আজিও ঝলমল করিতেছে। সেই সকল পদাবলীর সরসতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব-কবিতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কিয়দংশ মঙ্গলকাব্য, কিয়দংশ অনুবাদ কাব্য, কিয়দংশ চরিতাখ্যান। এই তিন শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশেষ কোনরূপ মৌলিক কবিত্বরস উৎসারিত হয় নাই এবং কেবলমাত্র অনুবাদকাব্য, চরিতাখ্যান অথবা মঙ্গলকাব্যের রচনা ও তাহার পরিবর্তন ও পরিমার্জনেই যদি বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্য আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে ইহার পরবর্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কখনই সম্ভব হইত না।

বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত জাগরণ হইয়াছিল বৈষ্ণব-কবিতায়। ভাষা-সৌষ্ঠবে, ভাব-গভীরতায় এবং ছন্দোমাধুর্যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র গৌরবস্থল বৈষ্ণব-পদাবলী। ইহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাবধারা মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা দেশের আবেগময় স্নেহ-প্রেমার্দ্র চিত্তবৃত্তি এই বৈষ্ণব-কবিতার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত সরসসুন্দর এবং ভাবপ্রবণ হইয়াছে।

ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে শাক্ত কবিদেরও শ্যামা-সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশেষে ইহারই প্রভাবের সহিত ইউরোপীয়—বিশেষ করিয়া ইংরেজি গীতি-কবিতার প্রভাব মিলিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ এই বৈষ্ণব কবিতারই গীত-মাধুর্য ও পদলালিত্যকে লালন করিয়া নূতন যুগের উপোযোগী নূতনতর কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

যে যুগে বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত বঙ্গের কাব্যকানন পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছিল উহা হইতেছে বঙ্গ-সাহিত্যের সুবর্ণময় যুগ। উহা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কাল। এই যুগে বহু মুসলমান পদকর্তারও আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাষার সরলতায়, কল্পনার অভিনবত্বে এবং ভাব-গভীরতায় সেই সকল মুসলমান কবিগণের পদাবলীর সহিত জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস ঘনশ্যামদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলীর তুলনা হইতে পারে। সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মত সেই সকল পদাবলীর গঠনের পারিপাট্য এবং ভাবের সৌরভ।

কিন্তু কি অদ্ভুত প্রেরণার ফলে মুসলমান কবিগণ পর্যন্ত বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীচৈতন্যদেবই তাহার প্রবর্তক। তবে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বেও আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্ম ছিল। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যদেবের বহু পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা যে বৈষ্ণব-মতবাদের

নিদর্শন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পদাবলী যদিও বাঙ্গালা কাব্যের অশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল, তথাপি পদাবলীর প্রসার ও সমাদর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বেশী হইয়াছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং পরবর্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া হরিনাম ও কৃষ্ণভক্তি প্রচারকেই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া তুলিযাছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

> কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
> রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
> নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
> ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥ ১

সঙ্কীর্ত্তন করিয়া এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী শুনিয়া তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে আছে যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের গীত তাঁহাকে গান করিয়া শোনান হইত—

> বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
> আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥ ২

অন্যত্র—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
> এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥ ৩

১। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৩শ পরিচ্ছেদ
২। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৩শ পরিচ্ছেদ
৩। " " ১০ম পরিচ্ছেদ

কোন্ কোন্ পদ আস্বাদন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন, তাহাও চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির—

কি কহব রে সখি। অনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥

এই পদটি শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এবং নিম্নোদ্ধৃত চণ্ডীদাসের পদটি শুনিয়া শ্রীরাধিকার মত ব্যাকুলতা তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত—

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি। কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে॥ ১

এইভাবে চৈতন্যদেবের অনুরাগ ও আগ্রহের ফলে বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাক্ চৈতন্যযুগের পদকর্তাদের পদাবলী বৈষ্ণব-সমাজে খুবই সমাদৃত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ভাবের ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রচার হইতে লাগিল। বহু মুসলমানও তখন শ্রীচৈতন্যদেবের সেবক হইয়াছিলেন।—

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমান্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান। ২

১। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ
২। " আদি ১০ম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এই বঙ্গদেশে প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল। তাঁহার সঙ্কীর্তনের প্রভাব এমনই অসীম ছিল যে, উহা শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বুদ্ধিমন্ত খান তাঁহার সেবক হইয়াছিলেন—

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে আছে—

বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥ ৩

নীলাচলে রথযাত্রার সময়ে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগোষ্ঠী গমন করিয়াছিলেন, তখনও—

চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥ ৪

যে হুসেন সাহ বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান উৎসাহবর্ধক হইয়াছিলেন, অনেকে মনে করেন, তিনিও চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রভাব ভিন্ন ঐরূপ মহান্ ও উদার হইতে পারিতেন না—

যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র। ১

চৈতন্যদেবের পার্ষদ এবং শিষ্য গদাধর দাসের কীর্তন শ্রবণে মুসলমান কাজী পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥ ২

৩। চৈতন্যভাগবত, আদি ১০ম পরিচ্ছেদ
৪। চৈতন্যভাগবত, অন্ত ৯ম পরিচ্ছেদ

সর্বসাধারণের মনের উপরে চৈতন্যদেবের যেমন অসীম প্রভাব ছিল, তেমনই তাঁহার প্রভাবে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই আবির্ভাব বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ গীত সুর ও ভাবধারা উৎসারিত করিয়া দিয়া বঙ্গদেশকে মধুর আনন্দে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবে পদাবলী-সাহিত্যের এই বিকাশ দেখিয়া একটি রূপকের কথা মনে হয়। বসন্তাগমের ঠিক পূর্বে কোকিল ডাকে একটি দুইটি। কিন্তু বসন্তাগমে যখন সমস্ত কুঞ্জকানন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন সমস্ত আকাশ-বাতাস কোকিলের কুহুরবে মুখর হইয়া উঠে। বসন্তের আগমনে কোকিলের মনে যেমন অসীম আনন্দের সঞ্চার হয়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তেমনই কবিগণের অন্তরে এক অপূর্ব আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল এবং উহা তাঁহাদের গীতলহরীকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল। সেই মধুর আনন্দের স্রোতে মুসলমান কবিগণ পর্যন্ত অবগাহন করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। রাধার বর্ণনা অথবা তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের জন্য বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শই ছিলেন চৈতন্যদেব। কি হিন্দু, কি মুসলমান কবি, সকলেই রাধাভাবের মূর্তিকে তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া রাধাকে গড়িয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ কল্পনার প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই। চৈতন্যদেব নিজেই ছিলেন প্রেমমূর্তি। তাঁহার প্রেমের আগ্রহে ও আর্তিতে, বিরহে ও মিলনে বৈষ্ণব-সাধনার প্রণালীগুলি মূর্তি পাইয়াছিল। রাধাভাবে আবিষ্ট চৈতন্যদেবের প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুসলমান পদকর্তাগণও এমন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারাও রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমুদ্রতরঙ্গ দেখিবামাত্র চৈতন্যদেব তাহাকে যমুনা বলিয়া ভুল করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইয়াছে এইরূপ ধারণায় এমন আনন্দ তাঁহার হইত যে তাহাতে তাঁহার দেহ কদম্বের মত কণ্টকিত হইয়া উঠিত। নদী দেখিবামাত্র উহা যমুনা বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইত—

যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি ॥ ১

পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধিকার যে প্রেমাবেশ, তাহা চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশেরই অনুরূপ। ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়া চৈতন্যদেবের সুমধুর ভাবাবেশের চিত্র চৈতন্যচরিতামৃতে অঙ্কিত হইয়াছে—

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি, কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥ ২

ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলিমা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। মেঘের নীলিমা দেখিয়াও সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধিকারও এইরূপ ভাবাবেশ দেখা যায়। চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পদে আছে—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরিখনে।

গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে যে, শ্রীরাধিকা মেঘ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন এবং তমাল-তরুর নীলিমা দেখিয়া নির্জনে তাহাকেই আলিঙ্গন করেন—

জলদ নেহারি' নয়নে ঝরু লোর
...
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল।

শ্রীচৈতন্যদেবও—

"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥

—গোবিন্দদাসের কড়চা

১। চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ।
২। চৈতন্য-চরিতামৃত—মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-নাম শুনিবামাত্র বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন—ভাবাবেগে বাক্যহীন হইয়া যাইতেন। পদাবলী-সাহিত্যে রাধিকার অবস্থাও অনেক সময়ে এইরূপই হইয়াছে—

যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়।
পায়ে ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি যায়॥
সোনার পুতলী যেন মাটিতে লুটায়॥

—চণ্ডীদাস

সুতরাং পর চৈতন্যযুগের পদাবলীর রাধাকে শ্রীচৈতন্য ভিন্ন আর কি বলিব? কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার জীবনের ব্রত হওয়ার পর হইতে চৈতন্যদেব সেই পরম-আনন্দময়ের চিন্তাতেই মুগ্ধ ও আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, সঙ্কীর্তনের আনন্দে তিনি বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িতেন। সেখলাল নামক একজন মুসলমান বৈষ্ণব-কবি শ্রীরাধিকার মুখ দিয়া চৈতন্যদেবেরই সেই বিহ্বল অবস্থাই ব্যক্ত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়—

শয়নে স্বপনে ঘরেতে পিরিতি,
করিনু শ্যামের সনে।
সেই হইতে মোর চিত বেয়াকুল
কিছুই না লয় মনে। —সেখলাল

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে বৈষ্ণবেরা হয়ত আরাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। তিনিই শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই জীবনের ঘটনাসমূহ পর-চৈতন্যযুগের পদ-কর্তাদের মনে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বিষয়টি গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। সেই অসীম প্রভাব হইতে মুসলমান কবিগণ পর্যন্ত মুক্ত হইতে পারেন নাই।

কোন কোন মুসলমান পদকর্তা অবশ্য ব্রজ-লীলার কাব্যোচিত মাধুর্যে মোহিত হইয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, অধিকাংশ মুসলমান পদকর্তা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্ব সমাজে নিন্দার আশঙ্কা থাকিলেও বৈষ্ণব ধর্মেরই অনুপ্রেরণায় স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের সেই কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আকবর সাহা, নসীর মামুদ, ফকির হবিব, ফতন প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের পদাবলীর ভণিতার ভিতর দিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল মুসলমান পদকর্তাদের পদসমূহে যে-রকম উপলব্ধির গভীরতা আছে, তাহা বৈষ্ণব অনুপ্রেরণা ভিন্ন সম্ভব নহে। যেমন—

আগম নিগম বেদ-সার,
লীলা যে করত গোঠ বিহার,
নসীর মামুদ করত আশ,
চরণে শরণ দানরি॥

কবি এখানে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ মাগিয়াছেন, কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ফকির হবিব নামক একজন মুসলমান পদকর্তা বলিতেছেন—

ফকির হবিব বলে, কানুরে দেখিনু ভালে,
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মন করে হিয়া কানুরে সমুখে থুইয়,
নিরবধি দেখহুঁ সদায়॥

একেবারে বৈষ্ণবভাবাপন্ন না হইলে প্রাণের আকুতি এই ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না।

কবি সৈয়দ মর্তুজা শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান—যেন সেই পরমপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়াই গাহিয়াছেন—

সৈযদ মর্তুজা কহে নাগর রসিয়া।
আন ভুলায়ল মুরলী শুনাইযা॥

ইঁহারই—

শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি॥

এই পদটির শেষাংশে আছে—

সৈয়দ মর্তুজা ভণে, কানুর চরণে,
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পারে,
জীবন-মরণ ভরি॥

এই গীতটিতে পদকর্তা নিজে শ্রীরাধার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার হৃদয়-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদছায়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। অন্যান্য বহু মুসলমান পদকর্তাও রাধার বেনামী তাঁহাদের নিজেদের মিলন-ব্যাকুলতা ব্যক্ত করিয়াছেন। যতন নামক এক পদকর্তা গাহিয়াছেন—

সহিতে না পারি আর, কৃপা করি কর তার,
জনম অবধি দুখ পাইনু।
অধম যতনের সাধ, ক্ষেম প্রভু অপরাধ,
রাঙ্গা পায় শরণ লৈনু।

শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রার্থনা করিতে ইনিও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে চাঁদ কাজির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তাঁহার পদে উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বও বর্তমান। যেন শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর

বংশীধ্বনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং তিনি বংশীধারীর সহিত মিলনের আকুলতাবশত গাহিয়াছেন—

চাঁদ কাজি বলে—বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি, না দেখিলে হরি॥

এই সকল মুসলমান পদকর্তার হৃদয়ের নিভৃত কোণে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি যেন অলক্ষ্য হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই অপূর্ব বংশীধ্বনিই মুসলমান পদকর্তাদের মুগ্ধ কবিচিত্তে কবিত্বরস উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত পদাবলীর ভিতরেই এই সকল পদকর্তাদের বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে মুসলমান কবির সংখ্যা অল্প নহে। কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল, যেমন—অলিরাজা, আকবর সাহা, কবীর, গরিব খাঁ, চাঁদ কাজি, নসীর মামুদ, ফকির হবিব, ফতন, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, সেখলাল, সৈয়দ মর্তুজা ইত্যাদি। কবি হিসাবে ইঁহাদের অনেকেই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে এমন একটি কোমল মধুর উজ্জ্বলতা থাকে যাহা আমাদিগের প্রাণে ও মনে এক অপূর্ব উন্মাদনা আনিয়া দেয়। এই কোমলতা এবং মাধুর্য, যাহাকে রাস্কিন্ infinite tendernessও বলিয়াছেন, জুবেয়ার যাহাকে বলিয়াছেন, delicacy এবং সেক্সপীয়র যাহাকে fine-frenzy বলিয়াছেন, তাহার সন্ধান এই সকল মুসলমান কবিদের পদাবলী আস্বাদন করিলেও পাওয়া যায়।

কবির পরিচয় তাঁহাদিগের কাব্যে। কাব্য বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করি। কিন্তু উল্লিখিত মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তাগণের অনেকেরই জীবন তমসাবৃত।

কারণ কবিগণ নিজেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং কোনও জীবনীলেখক তাঁহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ইঁহাদেব জীবনেব শিক্ষা-দীক্ষার যেটুকু পবিচয আমরা পাই, তাহা তাঁহাদের কাব্যেই বর্তমান আছে। কাব্য হইতেই তাঁহাদের ভাবপ্রবণতা ও অন্তর্জীবনেব ধারণা কবিয়া লওয়া যায়।

নিম্নে এক এক কবিয়া কয়েকটি কবি ও তাহাদের কাব্যেব পবিচয় প্রদত্ত হইল।—

আলওয়াল :—

বঙ্গসাহিত্যে যে-কয়জন মুসলমান কবি পদ-রচনা কবিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি আলওয়াল একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। ইঁহাব রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বর্ণনাচাতুর্যে ও সরস শব্দ-যোজনাব মাধুর্যে খুবই সুন্দব।

ইনি ফবিদপুব জেলাব ফতেয়াবাদ পবগণার জালালপুব নামক স্থানের অধিপতি সমশেব কুতুবেব মুসলমান সচিবেব পুত্র ছিলেন। যৌবনে ইনি ইঁহার পিতার সহিত জলপথে যাইতেছিলেন। সেই সময়ে ইঁহারা পোর্তুগীজ-জলদস্যু হার্মাদদেব দ্বারা আক্রান্ত হন। সেই আক্রমণে কবির পিতা প্রাণত্যাগ কবেন। কিন্তু কবি কোনরূপে রক্ষা পাইয়া রোসাঙ্গেব (আবাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। সঙ্গীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি মাগন ঠাকুরের (ইনি মুসলমান ছিলেন) বিশেষ অনুবাগ ছিল। তিনি আলওয়ালের কবিত্বশক্তিব পবিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী প্রণীত 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করিতে বলেন। আলওয়াল যখন 'পদ্মাবৎ কাব্য' রচনা শেষ করেন, তখন ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি আবার তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং সাহিত্য-প্রচেষ্টায় উৎসাহদাতা মাগন ঠাকুরের

আদেশে 'সয়ফল মুলুক' ও 'বদিউজ্জমাল' নামক ফার্সী কাব্যের অনুবাদে রত হন। কিন্তু অনুবাদ শেষ হইতে না হইতে শা সুজা আরাকান আক্রমণ করেন এবং আলওয়াল বন্দী হন। পরে কারামুক্ত হইয়া এই দীন কবি সৈয়দ মুসা নামক একজন সদয় ব্যক্তির নিকট আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার ভগ্ন-বীণায় পুনরায় তার সংযোজনা করিয়া অসমাপ্ত কাব্য দুইটি শেষ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না' নামক দুইখানি কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন, এবং পরে সৈয়দ মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তির আদেশে ফার্সী কবি নিজামী গঞ্জনবীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'হফ্ত পায়কার' বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। উক্ত কাব্য কয়খানি আলওয়ালের মৌলিক সৃষ্টি নহে। সবগুলিই হয় হিন্দী না হয় ফার্সী কাব্যের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদ হইলেও প্রত্যেকখানি কাব্যের অনেক স্থলেই চমৎকার কবিত্ব ও নূতন সৃষ্টির অভিনবত্ব আছে। আলওয়ালের সমস্ত কাব্যের মধ্যে তাঁহার 'পদ্মাবৎ' কাব্যখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে কবির পাণ্ডিত্য, গভীর সংস্কৃত-জ্ঞান, সরস শব্দযোজনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে চমৎকার ঋতু বর্ণনাও আছে। তাঁহার রচনায় কলসীকক্ষা রমণীর জল ভরিয়া আনার বর্ণনা, বয়ঃসন্ধি বর্ণনা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ইনি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের ও কাশীরাম দাসের পরবর্তী কবি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, ১৬১৮ সালের কাছাকাছি কোনও সালে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শা সুজার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাহার পূর্বে কবি আলওয়াল যে বর্তমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

কবি আলওয়াল যে বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার 'পদ্মাবৎ' কাব্য হইতে পাওয়া যায়।—

আড আঁখি বক্রদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয় ।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয় ॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয় ।
বিরহ-বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় ।
অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে ॥
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে ।
সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে ।
খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে ।
মদনধনু ভুরুবিভঙ্গে ।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে ॥

আলওয়ালের এই বয়ঃসন্ধি বর্ণনা বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বহু স্থানেই বিদ্যাপতির বর্ণনার চমৎকারিত্ব আলওয়ালের বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলওয়ালের—

চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জনগমন শোভিতা ॥

বিদ্যাপতির —

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি'।

এই বর্ণনার কথা মনে করাইয়া দেয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যাপতির পদাবলীর মাধুর্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। আলওয়ালের উপর জয়দেবেরও প্রভাব ছিল। অনেক স্থানেই তাঁহার কবিতার কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত। বিদ্যাপতির বর্ণনা-চাতুর্য ও জয়দেবের সরস শব্দযোজনার সৌকর্য মিলিয়া আলওয়াল কবির কবিতাকে সরসসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

আলওয়ালের নিম্নলিখিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদটি সমধিক প্রসিদ্ধ—

রাধা অভিসারে গিয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছেন, তাঁহার ননদিনী কুটিলার তিরস্কার রাধিকার অসহ্য বোধ হইতেছে। কুটিলা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে —হে সুন্দরী তুমি প্রত্যূষে যমুনায় গিয়েছিলে ; এখন দিবাবসান হইয়াছে, রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিযাছে। এত বিলম্ব তোমার কি জন্য হইল ?—

ননদিনা রস-বিনোদিনী
ও তোব কুবোল সহিতাম নারী ॥ ধ্রু ॥
ঘরেব ঘরণী জগত মোহিনী
প্রত্যূষে যমুনায গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব কবিলি।

অভিসারিকা শ্রীবাধা উত্তরে বলিতেছেন—

প্রত্যূষ বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবাবে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥
সীথের সিন্দুর নয়নের কাজল
সব ভাসি' গেল জলে।
হেব দেখ মোর অঙ্গ জরজর
দারুণি পদ্মের নালে ॥

এই ভাবে রাধিকা তাঁহার নিজের অঙ্গের অভিসার-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া উহা গোপন করিতেছেন। এই উক্তির পশ্চাতে রাধিকার যে মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব। দুর্গম পথে অভিসার-যাত্রা করিয়া এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া রাধা মলিন হইয়াছিলেন—তিনি তাঁহার করের কঙ্কণ হারাইয়াছেন এবং তাঁহার সিন্দুরের রেখা ও নয়নের কাজল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা গোপন করিয়া তিনি যে ভাবে অভিসার-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তাঁহার করুণকোমল রূপটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই পদটির শেষে কবি বলিতেছেন—

আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে
জগৎ-মোহিনী বামা ॥

কবি আলওয়াল যে মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় এই পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই ভণিতা হইতে পাওয়া যায়।

আলওয়ালের পদাবলীতে বৈষ্ণব কবিদের মত যে উপলব্ধির গভীরতা এবং বর্ণনাকৌশল আছে, তাহা পাঠকদিগকে মুগ্ধ করে।

আকবর সাহ :—

ইঁহার একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া গিয়াছে। এককালে যেমন কানু ছাড়া আর গীত ছিল না, পরে তেমনি গৌরচন্দ্রের চরিত-বর্ণনা ছাড়া আর গীত কল্পনা করা যাইত না। বৈষ্ণব পদাবলীগুলি গান করিয়া শোনানো হইত। সেই কৃষ্ণলীলা গাহিবার পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া শ্রোতাদের মন ভক্তিতে প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া লওয়া হইত। নিম্নোদ্ধৃত আকবর সাহের রচিত পদটিতে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে।

সঙ্কীর্তনের আনন্দে বিভোর চৈতন্যদেবের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া কবি গাহিয়াছেন—

জিউ জিউ মেরে মন চোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥ ধ্রু॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া।
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥
ঐছন পহুকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনরূপ মহাযজ্ঞ দর্শনে মুসলমানগণ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আকবর সাহও সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন-লীলা চাক্ষুষ দর্শন করিয়া এই পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় এই পদটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এ রতন বাজে-মারকা নহে, প্রাচীন এবং হীরার ধারে প্রস্তুত।" ভগবৎপ্রেমে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৌরাঙ্গের নৃত্যের বর্ণনা লোচনদাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি পদকর্তাদের গানেও পাওয়া যায়। গরিব খাঁ নামক একজন মুসলমান পদকর্তারও একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেবের ভুবনভুলানো গৌর-বরণ দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সেই গৌরবর্ণ কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে রাই-কানু দুইজনের রূপের সারাংশ লইয়া হয়ত গৌরাঙ্গের অপূর্ব রূপমাধুর্য সৃষ্ট হইয়াছে। কোন্ রূপ-পাথারে ডুবিয়া চৈতন্যদেবের বর্ণ গৌর হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য গরিব খাঁর অসীম কৌতূহল হইয়াছে। রূপমুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন—

শরমে শরমে পেলায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু য্যামন দুধে জলে ম্যালায়ে গেল ॥
চাঁদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুব্যা অবশ হ'ল ॥
সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনম-ভর ডুব্যা রহিল ॥
গরিব তাই হ্যাথার লাগি' মনের দুখে মন গুমরি' পাগল হ'ল ॥
সে রসের পাথার পেল না কোথায়,
শ্যাষে আচোট ভূঁয়ে পড়িয়ে ম'ল ॥

জানি কার রূপ-পাথারে ডুব্যা চাঁদ গৌর হয়েছে।
য্যামন ক'রে বাস্‌ত ভাল হ্যা ওর মন-মত আছিল।
ও মন আছিল হ্যা রূপের কাছে।
গরিব কয় ধরম্ ব'লে ডুব্যা প্যালে না, তাই খাপি নদেয় এয়েছে ॥

কবীর :—

ইনি হিন্দী সাহিত্যের সাধক-কবি নহেন। ইঁহার ভাষাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইঁহার একটি পদে বসন্তোৎসব উপলক্ষে হোলী-খেলার চমৎকার বর্ণনা আছে। ব্রজযুবতীরা চুয়া-চন্দন ও গোলাপের সুগন্ধমিশ্রিত আবীর লইয়া শ্যামের অঙ্গে দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণও ফাগ লইয়া ঘুরিতেছেন—কখনও বা শ্রীরাধিকাকে সেই ফাগের রঙে রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। ফাগের বর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বারে বারে শ্রীরাধিকা অবগুণ্ঠনদ্বারা তাঁহার মুখ ঢাকিতেছেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাঁহার মুখ-চন্দ্র বার বার লুকাইতে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন মেঘের আড়ালে চাঁদ গিয়া আত্মগোপন করিতেছে।

ব্রজ কিশরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন, আবীর গোলাব,
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

ফাগু হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি,
ফিরি ফিরি বোলত রাই।
ঘুমট উঠায়েঁ বয়ান ছপায়ত,
বেরি বেরি যৈসে মেঘসে চাঁদ লুকাই॥
ললিতা একা সখী, ফাগু হাতে করি,
দেখত কানু নয়ান।
বৃকভানু কিশোরী দুহুঁ বাহু ধরি,
মারত শ্যাম বয়ান।
আওর এক সখী, জীউ জীউ করি,
কাঁহা লাগাও আবীর।
কমরি ফাগু লেই, কান নযান বেরি বেরি দেয়ত'
হাঁ হাঁ করত কবীর॥

ইহার সহিত বিখ্যাত বৈষ্ণব-পদকর্তা জ্ঞানদাসের এই কবিতাটি তুলনীয়—

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে।
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥ ইত্যাদি

কবীরের পদটিতেও জ্ঞানদাসের এই পদটির মত বর্ণনার চমৎকারিত্ব আছে।

নসীর মামুদ :—

ইঁহার একটিমাত্র পদ বৈষ্ণবদাস কর্তৃক সঙ্কলিত "পদকল্পতরু"তে

পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাব জীবনের কোন বৃত্তান্তই পাওয়া যায় না। তবে ইনি হয়ত পশ্চিমবঙ্গবাসী ছিলেন। কারণ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নশীর মামুদেব কোনও পদ দৃষ্ট হব না।

ইঁহার যে পদটি পাওয়া গিযাছে, সেটি গোষ্ঠবিহারের পদ। পদটির বচনা অতি সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম মুবলি-ধ্বনি করিয়া ধেনুগুলির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সঙ্গীগণও তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। যমুনা-তীরে ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গাভীদিগকে অহ্বান করিয়া কানু যাইতেছেন এবং খেলা করিতেছেন। তাঁহাবা কিশোর বয়স এবং মুখে নীল নব-জলধরের কান্তি। সুন্দর গুঞ্জা-হার তাঁহার কণ্ঠে এবং মুখে মদন দীপ্তি পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এই গোষ্ঠলীলা আগম নিগম বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রেব সার।

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম,
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেনু
মুরলি আলাপি গানরি।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি'
তরণি তনযা তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আওবি আওবি
ফুকবি চলত কানরি॥
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা-হার
বদনে মদন ভাণরি।

আগম নিগম বেদ সার
লীলা যে করত গোঠবিহার
নশীর মামুদ করত আশ
চবণে শরণ দানরি ॥

ভণিতার অর্ধ কলিটি পদকর্তার কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক। এই পদটির ছন্দঝঙ্কার এবং অপূর্ব শব্দচিত্র বচনাব কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয।

ফকির হবিব নামক মুসলমান পদকর্তার একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে কবি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিয়াছেন। পদটি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় বিশেষ কোনও অভিনবত্ব না থাকায় উহা আব উদ্ধৃত করা হইল না।

সেখলাল :—

ইনি চমৎকারভাবে অনুবক্তা শ্রীরাধার বর্ণনা কবিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎসুক হইয়া বিরহের যে অনুভূতি, তাহা সুন্দবভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

শুন লো সজনি কিছুই না জানি
কি বুধি করিব আমি।
তারিতে নারিব দৈবে মরিব,
নিশ্চয় জানিহ তুমি ॥
শয়নে-স্বপনে, শ্যাম বঁধুর সনে
সুখে গিয়াছিনু নিদ।

. . .

পাঁজর কাটি শ্যাম বঁধুরে কেবা,
দিয়া নিল সিঁদ।
তোমারে কহিনু সখি, পিরীতির এই রীতি
সদাই পরবশ দে।
সেখলালে কয়, যে জন তাহার হয়,
সে বিনে জানিবে কে॥

ফতন নামক এক পদকর্তার একটি পদেও অনুরক্তা রাধার বিরহিণী-রূপটি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রাধিকার সেই ব্যাকুলতা যেন আমাদের চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে। রাধিকা বলিতেছেন—

আরে মোর একি পরমাদ হইল।
ছটফট করে হিয়া কহ না বঁধুরে যাইয়া
কি দিয়া কিবা গুণ কৈল॥
জীতে মোর নাহি সাধ, মিছামিছি পরিবাদ
মিছা পাকে ঠেকিয়া রৈনু।
এমন করম মোর, কলঙ্কের নাহি ওর,
সহিতে না পারি আর কৃপা করি কর তার,
জনম অবধি দুখ পাইনু॥ ইত্যাদি

সেখ ভিখন :—

ইঁহার একটি "খণ্ডিতা"র পদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে সেই সকল লক্ষণ বর্তমান। ইহাতে অভিমানিনী রাধা যে উক্তি করিতেছেন তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার দুঃখপূর্ণ সরল হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করিতেছে—

সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই।
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন ঠাঁই॥ ধ্রু॥
কেমন বানালে চূড়া, শ্রবণে দুলিতেছে,
মেলিতে নার দুটি আঁখি।
হব না মথুরাগতি, কি কব চূড়াব ভীতি,
শ্যাম-অঙ্গে লাগিয়াছে সাখি।
কুঙ্কুম কস্তূরী আর, সুগন্ধি তাম্বুল,
থুইয়াছিনু সিয়র উপব।
হা হরি হা হবি করি', জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে॥
সেখ ভিখনে ভণে, বড় দুঃখ বাইয়ের মনে,
পাশরিলে পূবব পিবিতি।
আমাব করম দোষে তুমি থাক অন্য পাশে,
হউক মেন রাধাব মিরিতি॥

সৈয়দ মর্তুজা—

ইঁহাব একটি পদ "পদকল্পতরু"তে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই কবির কোনও পরিচয় আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। কবি হিসাবে ইনি যে একটি শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহার শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, মান, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি-সম্বন্ধীয় পদগুলি অতি মনোহর। ইনি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিতেছেন—

ভুবনমোহন রূপ অতি মনোহর।
ঝলমল করে রূপ দেখিতে সুন্দর॥

তরুমূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
কত কত নাগরী বহে চাঁদ-মুখ চাহিয়া॥
জিনি শশী দিবাকর জিনিয়া উজর।
আন মোহিত হইল ব্রজ রমণী সকল॥
কপালে তিলক চাঁদ জিনি তারগণে।
চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে। ইত্যাদি

এই কবি অল্প কথায় 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' শ্রীরাধিকার রূপের যে আভাষ দিয়াছেন তাহা অপূর্ব—

একে তোমাব গোরা গা, না সহে ফুলের ঘা,
বায হেলিছে সব অঙ্গ।

সৈয়দ মর্তুজার নিম্নোদ্ধৃত আত্মনিবেদনের পদটি খুব প্রসিদ্ধ এবং ইহা "পদকল্পতরু"তে স্থান পাইযাছে।—

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি!
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নাবি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীব প্রাণ করে আনচান্
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছাযা
শুন শুন পরাণকানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥ ইত্যাদি

বৈষ্ণব-পদাবলী কতকগুলি রস অবলম্বন করিয়া রচিত। যেমন পূর্বরাগ,

মান, বিরহ, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণও ঐ বিভিন্ন রস অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কোনও এক প্রকার রস অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কবিতা গড়িয়া উঠে নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ। সকল পদকর্তারাই হয় শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা অথবা লীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের আশ্চর্য কৃতিত্ব এইখানে যে, ইংরেজ কবি কীটসের মত তাঁহারা অতি সহজেই শব্দ ও উপমার সাহায্যে একটি সৌন্দর্যচিত্র জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনীয় বিষয় সঙ্কীর্ণ হইলেও তাঁহারা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপূর্ব।

পদাবলী সাহিত্যের বহু পদে শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনির আহ্বানের সুর বাজিয়াছে। সেই মর্মভেদী বংশীধ্বনি শুনিলে রাধার আর ঘরে থাকাই দায়—তিনি চঞ্চলা হইয়া উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠেন। সেই বাঁশীর সুরের এমনই আকর্ষণী শক্তি। বৈষ্ণব-কবিগণ বাঁশীর সুরে রাধার আকুলতা ব্যক্ত করিয়া রূপকভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভক্তের আকুতি প্রকাশ করিয়াছেন। বহু বৈষ্ণব-পদে সেই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষের বাঁশীর সুরটি ধ্বনিত হইতেছে। সেই পরমপুরুষ—আনন্দময়ের সুর যাহার কাণে পৌঁছায় সে কোনরূপ সীমার বাঁধনে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিখ্যাত পদে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।

আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ সে না কোন্ জনা।
দাসী হঞাঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা॥ ইত্যাদি

এই বাঁশীর সুরের কথাই আছে। চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য বহু পদকর্তার পদে এই বাঁশীর সুরে রাধার চঞ্চলতা ব্যক্ত হইয়াছে।

মুসলমান বৈষ্ণব-কবিগণ তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্থলে সেই পরমপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধিকার মুগ্ধ ও ব্যাকুল অবস্থাটিকে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের ফেণী নদীর তীরবাসী 'অলিবাজা' নামক এক কবি গাহিয়াছেন—

বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ॥ ধ্রু॥
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব-মুনি,
ত্রিভুবন হএ জর জর।
কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি'
শুনিয়া দারুণ বংশী-স্বর॥
জাতি ধর্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীতি।
বংশী হেন শক্তি ধরে তনু রাখি' প্রাণী হরে,
বংশীমূলে জগতের চিত॥
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি' কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরুপদে অলিবাজা কয়॥

ইহা অপেক্ষা 'চাঁদ কাজি' নামক কবির নিম্নোদ্ধৃত পদে রাধার ব্যাকুলতা আরও তীব্র এবং তাঁহাব লজ্জাশীলা মূর্তিটি বড়ই মধুর। গুরু-জনের নিকটে রাধা যখন উপবিষ্টা তখন অকস্মাৎ বাঁশীর রব তাঁহার কানে পশিয়াছে—ইহাতে তিনি লজ্জায় বিব্রত। কিন্তু সে বংশীধ্বনি 'কানের ভিতব দিযা মরমে পশিযা' তাঁহাকে এমনই ব্যাকুল করিয়াছে যে, তাঁহাব অবরুদ্ধ আত্মা সীমাব বাঁধ ভাঙ্গিয়া অসীমেব সহিত মিলিত হইবাব জন্য নিবিড আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিযাছে।

বাঁশী বাজান জান না।
অসময বাজাও বাঁশী পবাণ মানে না।
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনাব কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী, আব আমি মইবি লাজে॥
ওপাব হইতে বাজাও বাঁশী, এপাব হইতে শুনি।
আব অভাগিযা নারী হাম হে সাঁতাব নাহি জানি।
যে ঝাড়ের বাঁশেব বাঁশী, সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে-মূলে উপাড়িযা যমুনায় ভাসাঁও॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুবে মরি।
জীমু না জীমু না আমি, না দেখিলে হরি॥

এই শ্রেণীর বৈষ্ণব-কবিতাগুলি অধ্যাত্ম রাজ্যের—এগুলি অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক। ক্রমাগত সীমার বন্ধন অতিক্রম করিযা অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ এই কবিতাগুলি। এখানে বৈষ্ণবদের সাধনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা আসিয়া পড়ে। বৈষ্ণব-পদাবলীতে এক স্বর্গীয় উপাদান আছে। উহা মানবীয প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুব চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছে।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম প্রদর্শনের জন্য রাধার রূপক কেন অবলম্বন করা হইল সে সম্বন্ধে কার্ডিনাল নিউম্যানের মতটি উল্লেখযোগ্য।

"If thy soul wants to attain the higher spiritual blessedness it must become a woman, yes, however manly thou mayst be among men"

—অর্থাৎ, "যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্মরাজ্যের পবিত্রতায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হয় তবে তাহাকে রমণীবেশে যাইতে হইবে। মনুষ্য-সমাজে তোমার যতই পুরুষকারের গর্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার রমণী সাজা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।" পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্যত্রও পাওয়া যায়—Make myself thy bride I will rejoice in nothing till I am in thy arms —st Juan.

—'হে প্রভু আমাকে তোমার বধূ-রূপে বরণ কর, আমি তোমার আলিঙ্গন লাভ করিতে না পারা পর্যন্ত কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিব না।'

বৈষ্ণব সাধকদের এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মুসলমান বৈষ্ণব কবিদেরও হইয়াছিল। কবি যেখানে বলিতেছেন —

ওপার হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥

ঐ বাঁশীর রাগিণী ইহজগতের নহে। ঐ রাগিণী এমন এক জগৎ হইতে আহ্বান আনিয়া দিয়াছে যেখানে এই রক্ত মাংসের শরীর লইয়া প্রবেশ লাভ করা যায় না। সেই পরমানন্দময় বংশীবাদকের সহিত দেহের মিলন হইবে না। কিন্তু, বাঁশীর সুর রাধার কানে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার সহিত সেই পরমানন্দময়ের মনের মিলন বা ভাবসম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই শ্রেণীর পদের আর একটি দিক্ আছে, তাহা কবিত্বের দিক্। এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে প্রবহমান নদীর সহিত তুলনা দেওয়া চলে। নদী কলকল করিয়া বহিয়া চলে। তাহার দুই পার্শ্বে তৃণপুষ্প, ফল-ফুল-পরিবৃত নয়নমুগ্ধকর সুন্দর বনরাজি, নগর, গ্রাম থাকে। কিন্তু যখন সে সাগরের বুকে লীন হইয়া যায় তখন উহা অসীম এবং অনন্ত-বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহার আর কোনও সীমা নির্দেশ করা চলে না। বৈষ্ণব কবিতাও সেইরূপ। জাগতিক নরনারীর প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে বৈষ্ণব কবিতা এমন এক স্তরে গিয়া পৌঁছায় যেখানে ঐহিক প্রেমের উন্মত্ত কাকলি থামিয়া যায়। ভগবৎ-প্রেমের লীলা-বর্ণনায় কবি মুখর হইয়া উঠেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণও সেই ভগবৎপ্রেমের লীলাবর্ণনায় যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনবদ্য। যে বিশিষ্টতার জন্য বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য, তাহা এই সকল মুসলমান কবিগণের পদেও বর্তমান। তাঁহাদের কবিতাও নানাবিধ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়া শেষে খরস্রোতা নদীর ন্যায় উহা আমাদিগকে অসীমের সন্ধান দিয়া অসীমের বুকে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

পরচৈতন্য যুগে বহু পদ রচনা হইয়াছিল। বিভিন্ন কবির পদাবলী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকার জন্য কাব্যরসিক ও ভক্তদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত। সেইজন্য পর পর অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিদের পদসঙ্কলন হইয়াছিল। বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ) "পদ-কল্পতরু"তে সৈয়দ মর্তুজা, নশীর মামুদের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, বৈষ্ণব-সমাজে মুসলমান কবিগণের পদাবলী খুবই সমাদৃত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে গীতিকবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অবশ্য মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ভেরী-নিনাদ শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার কাব্যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশেই অতি প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত গীতি-কবিতার সুরটি বঙ্গসাহিত্যে অব্যাহত ভাবে বহিয়া চলিয়া আসিতেছে। গীতি-কবিতার মধুর বেণুবীণানিক্কণ ধ্বনিত হইয়াছে। মধ্যযুগের হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণ মিলিয়া এই গীতি-কবিতার মৃদু উপাদানটিকে লালন করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের মুসলমান বৈষ্ণব-কবিগণ তাঁহাদের কাব্যবীণায় যে মধুর ধ্বনি ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহার অনুরণন আজও বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহারা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের সৌষ্ঠব-সাধন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেজন্য বঙ্গসাহিত্য চিরদিন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে, সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের গবেষণামূলক

আর একখানি পুস্তক

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা

ও

বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্ব

গ্রন্থকারের আর একখানি

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

বাংলা কাব্যে

মাইকেল মধুসূদন